নাবিক

রতন কুমার ঘোষ

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫।২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

১৫।২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র, ১৩৬৬

প্রচ্ছদ : শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মুদ্রাকর :

শ্রীমনোরঞ্জন নায়ক

শঙ্কর প্রেস

৩৭।১।১, শিবনারায়ণ দাস লেন

কলিকাতা-৬

সরোজ ও অনিমাকে—

নাবিক : ষষ্ঠদশকী যৌবনের এক যন্ত্রণাদগ্ধ ইতিহাস। ক্লান্তি হতাশা ভ্রান্তি বিমর্ষতা সব কিছুই আজ তার নিত্য সহচর। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একবার সে জীবনের শেষ কথাটি উচ্চারণ করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু ঈপ্সিত বাক্যটি উচ্চারিত হচ্ছে না কিছুতেই।

কিন্তু সেই ঈশ্বর-প্রেরিত বাণীটি কি আজকের বিভ্রান্ত যৌবন উচ্চারণ করতে পারবে না? তাকে কি কেবলই মৃতকল্প হয়ে পড়ে থাকতে হবে?

আজকের ঈশ্বর-হীন যৌবনের সেই প্রশ্নের পরম জবাব ধ্বনিত হয়েছে—'নাবিক' উপন্যাসে।

রতনকুমার ঘোষ

এই লেখকের ঃ

অহল্যার রাত্রি—	(উপন্যাস)
অমৃতস্য পুত্রাঃ—	(পূর্ণাঙ্গ নাটক)
ফেরা—	,,
সিঁড়ি—	,,
সম্রাট	,,
সমুদ্র শঙ্খ—	,,
প্রতিবাদ—	,,
সমুদ্র সন্ধানে/পাপপুণ্য	(একাঙ্ক)
পিতামহদের উদ্দেশ্যে/শেষ বিচার—	,,

টেলিগ্রাম এল।—ম্যারেজ ফিফ্‌টিন্‌থ। কাম শার্প—।—ফাদার।

প্রথমে আশ্চর্য হয়েছিলুম। সাধারণতঃ আমার কাছে চিঠিপত্র কম আসে। আমাকে কেউ চিঠি লেখার তাগিদ বোধ করে না। আমার নিজেরও চিঠি লেখার অভ্যাস নেই। সেক্ষেত্রে টেলিগ্রাম—বিস্ময়ের ব্যাপার বৈ কি!

তখন আমি দাড়ি কামাচ্ছিলুম। পুরানো ব্লেড; তাই বার বার কাঁচের গেলাসে ঘষে নিতে হচ্ছিল। দাড়ি কামাতে সময় লাগছিল প্রচুর।

টেলিগ্রাম পড়া অবধি পিওনটি দাঁড়িয়েছিল। বোধহয় এই তার অভ্যাস। কোন মন্তব্য না করে টেলিগ্রামখানা রাখতেই সে জিজ্ঞেস করল—কোন সুখবর কিনা? খুব সম্ভবতঃ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে কিছুই আন্দাজ করতে পারে নি।

বিয়ের কথা বলতে একগাল হাসিতে মুখ ভরে গেল তার। সে মুখে একটিও দাঁত নেই। সে বলল সুখবর পৌঁছে দেওয়া তাদের ভাগ্যে খুব কমই জোটে। প্রায়ক্ষেত্রে তাদের কানে ভেসে আসে কান্না। তাই সে বড্ড খুশি হয়েছে আজ। কথায় কথায় সে তার নিজের বিয়ের কথা বলল। এমনি টেলিগ্রামে সে সংবাদ পেয়েছিল সেদিন। সে আজ তিরিশ বছর আগেকার কথা!

কয়েকটা মনের কথা বলতে পেরে তাকে তখন খুব খুশি মনে হল। ওকে একটা টাকা দিতে গেলাম। কিন্তু ও নিতে রাজী হল না। হয়তো অনেককাল পরে ধূলি ধূসরিত কয়েকটি সুখ-

স্মৃতি মনের মধ্যে গুন গুনিয়ে উঠেছে। বকশিস নিয়ে তার মেজাজ নষ্ট করতে ও নারাজ।

পিওন চলে গেল। চোখে পড়ল দেওয়ালে ঝুলানো ক্যালেণ্ডারের ওপর।—তু'মাস তার পাতাই ছেঁড়া হয় নি।

ক্যালেণ্ডারের পুরানো পাতা ছিঁড়ে ফেললাম।—পনেরোই—এখনো পাঁচদিন বাকি।

ছুটি নিতে হবে। বছরের পুরো ছুটিটাই হাতে জমা রয়েছে। আমি ছুটি কম নিই। বলা চলে ছুটি নেবার কোন প্রয়োজনই হয় না। সপ্তাহের ছ'দিন কাজের পর সপ্তম দিনটি বিশ্রামের পক্ষে যথেষ্ট। বরং ঐ সপ্তম দিনটিই আমার খারাপ লাগে। কাজের অভাবে হাঁপিয়ে উঠি। লক্ষ্যহীন শুয়ে বসে ঘুমিয়ে সময়ের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই।

কোন কোন রোববার অফিসে যাই। কাজের ডাকে নয়। নির্বাক সময়ের নিষ্ঠুর বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে। সেখানে গিয়ে আঁক কষি। খাতা-পত্তর মেলাই। সময়কে ঠেলে দিই অনবসর কাজের মাঝে। যাতে অবসরের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে পারি।

মাঝে মাঝে সোমা আসে। এসে আমার খাতা-পত্তর উল্টে দেয়। কলম কেড়ে নেয় হাত থেকে। জোর করে বের করে নিয়ে যায় অফিস থেকে।

আমি কোন আপত্তি করি না। কারণ জানি—সোমার কাছে আমার কোন আপত্তি টিকবে না। ও হয়তো জিজ্ঞেস করে নদীতে স্নান করতে যাব কি না? মৃত্নু হেসে সম্মতি দিই। যদি তৎক্ষণাৎ সে বনভোজন করতে চায়—তাতেও সম্মতি থাকে আমার। সোমা একদিন আমাকে শহর ছেড়ে একটা গ্রামের মেঠো পথে নিয়ে গিয়েছিল। সেই জমি তখন কেবল চাষ হয়েছে। তার ভিতর দিয়ে সোমা আমায় হাঁটিয়ে নিয়ে গেল প্রায় তু'মাইল পথ। এক-সময় পরিশ্রান্ত হয়ে সে নিজেই বসে পড়েছিল। সেদিন তার সে

কী কান্না ; তখন আর তার পা চলছে না ফেরার পথে সারাপথ সোমা আমার কাঁধে ভর দিয়েই এসেছিল।

অফিসে ক'দিন খুব কাজের চাপ। বিদেশ থেকে অনেক মাল এসেছে। সেগুলি ছোট ছোট প্যাকেট করে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। অন্য জায়গায় চালান যাবে। আমদানী মালের হিসেব লিখে পারিনি। গতকাল রাত আটটা পর্যন্ত অফিসে ছিলাম। আজও হয়তো থাকতে হবে।

আমার পাশের টেবিল গীতার। সরু সরু আঙুল দিয়ে কলম ধরে কেমন সুন্দর লেখে। অক্ষরগুলো মুক্তোর মতো সাজান। আমি কয়েকদিন চেষ্টা করেছি। পারি নি।

বিকেল চারটে বেজে যাবার পর টেলিগ্রামের কথা মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি হাতের কাজ রেখে ছুটির দরখাস্ত লিখতে বসলাম।

কি লিখছেন রবীনবাবু ?—গীতার বোধহয় কৌতুক হল।

দরখাস্ত।

কিসের ?

ছুটির—

ছুটি !—বড় বড় চোখ করে তাকাল গীতা। সে চোখে বিস্ময়। যেন জীবনে একটি নতুন কথা শুনল সে। তারপর খিলখিল করে হেসে উঠল। যেন এর চেয়ে হাস্যকর ব্যাপার তার কাছে কিছু আর নেই।

তরতর করে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ঝট্‌কায় কাগজ-খানা টেনে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলল সে। বিনা দ্বিধায়। অনায়াস ঔদাসীন্যে। এটা যেন আমার ওয়েস্ট্‌পেপার বাস্‌কেটের একটা ফালতু কাগজ। ওতে কোনও প্রয়োজন নেই। থাকতে পারে না।

বাজে কাজ রাখুন।—গীতা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হাত ধরে টেনে নিয়ে

এল আমায়। তার টেবিলে একগাদা কাগজ। সেগুলি আমার দিকে ঠেলে দিল।

নিন, হাত লাগান।—আমাকে একটু সাহায্য করুন। গীতা অন্য একটা চেয়ার টেনে নিল। ঠিক আমার পাশেই।

গীতার কণ্ঠস্বর বরাবর বেশ জোরাল, আর স্পষ্ট। তাছাড়া নিজের প্রয়োজনে সেটার মাত্রাধিক্য ঘটে।

আমি কাজে হাত লাগাতেই গীতা একটু ঝুঁকে পড়ল আমার দিকে। একগুচ্ছ চুল তার কাঁধের পাশ বেয়ে আমার হাতের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

আমি বেরিয়ে যাচ্ছি রবীনবাবু—। চোখে চোখ মিলতেই হাসিতে সাজান দাঁত ক'টি ঝিক্‌মিকিয়ে উঠল গীতার। বিনু—বিনু এসেছে। ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলল গীতা। —সিনেমা……। কথা দিয়েছি……প্লীজ—। গীতার চোখের মণিতে মিনতি আর ব্যস্ততা।

আমার সম্মতি জানাবার অপেক্ষা করতে হল না। এক পলকা হাওয়ার মতো যেন নাচতে নাচতে গীতা অফিস থেকে বেরিয়ে গেল। আর আমার সামনে পড়ে রইল তারই একরাশ অসমাপ্ত কাজ। যা আজই শেষ করা দরকার।

এ আজ নতুন নয়। এমনি করে গীতা অনেকদিন বেরিয়ে গেছে। সহকর্মীদের মধ্যে আমার ওপরই সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে গীতা। সাহায্য চায়। সহানুভূতি দাবি করে। যখন খুশি ; যেমন খুশি। আমি বিরক্তিবোধ না করে বরং সাহায্য করি। শুধু ওকে নয়। সহকর্মীদের মধ্যে যে চায়—তাকেই। এটা যে আমি মানবিক কর্তব্যবোধ কিংবা উদারতাবশতঃ করি—তা নয়। আরও কিছু সময় প্যাকেট-করা অথবা ডেসপ্যাচের কাজ পাই বলে।

সহকর্মীদের কেউ কেউ হাসে। ঠাট্টা করে। আমার নির্বুদ্ধিতা

নিয়ে মজার সব গল্প বানায়। তার কোনটি মিথ্যে। কোনটি অশ্লীল। কোনটি হাস্যকর। আবার তাদেরই যখন অফিস পালাবার প্রয়োজন হয়—তখনই তারা আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

প্রথম যেদিন গীতা অফিস পালায় সেদিন সে কথা দিয়েছিল যে আমায় নিয়ে একদিন সে সিনেমায় যাবে। তারপর প্রায় বছর ঘুরে এল। ইতিমধ্যে বিনুর ডাকে বেশ কয়েকবার অফিস পালিয়েছে। আর প্রতিবারই সে আমাকে নতুন করে কথা দিয়েছে—একদিন যেতে হবে রবীনবাবু। ভাল বই এলেই। কিন্তু ভাল বই আর আসে না!

অন্ধকার রাত। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে বাইরে। অফিসে বসে এত সময় টের পাই নি। রাস্তা ছেড়ে মাঠের অন্ধকারে পায়ে-চলা পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। চোখজোড়া আর আলো সইতে পারছে না যেন। কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। মনে হচ্ছে যেন যে কোনও সময়ে ছিঁড়ে যেতে পারে। বাসার কাছে এসে মাঠ ছেড়ে রাস্তায় উঠলাম। চীনা রেস্টুরেন্ট-এ লোক ভর্তি। সোমা একদিন এখানে নিয়ে এসেছিল আমাকে।

বাসায় ঢোকার ছোট গলিপথটুকু অন্ধকার। এই অন্ধকার পথটুকু, কি জানি কেন, আমার ভাল লাগে। যদিও পথের উঁচু নিচুতে মাঝে মাঝে হোঁচট খাই—তবু অফিস ফেরত ঘরে ঢোকার মুখে বার কয়েক পায়চারি করি। আমার এই অদ্ভুত স্বভাবের কথা শুনে রসিক হো হো শব্দে হাসে। আর তার দজ্জাল বৌটা রাগে গজ গজ করে। সুযোগ পেলেই গালাগালি দেয়। অনবরত আমার স্বভাব-চরিত্রের প্রতি তার সন্দেহ।

রসিক কিন্তু ঠাণ্ডা মেজাজের। তালি-দেওয়া ধুসর রঙের ফুল-প্যাণ্ট পরে সকালবেলায় সে কাজে বেরিয়ে যায়। পিঠে ফ্লাস্ক, খাবার পাত্র। যাবার আগে নিচু থেকে উপরে আমার ঘরে আসে। আমাকে ঘুম থেকে জাগায়। তার ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে দেয় খেতে।

ততক্ষণে তার বৌ চিৎকার করে সময় জানাতে শুরু করে। তরতর করে নিচেয় নেমে রসিক আর দেরি করে না। কাজে বেরিয়ে যায়। সারাদিন রাজমিস্ত্রীর কাজ করে ঘরে ফেরে বেশ একটু রাত হলে। তখনও সে সকালবেলাকার মত হাসিখুশি ও স্বাভাবিক। রসিকের চোখে-মুখে কোনদিন ক্লান্তি দেখি নি।

রাত্তিরে রসিক আমার ঘরে আসে না। তার বৌয়ের জন্য আমারও সাহস হয় না কথা বলতে। পারতপক্ষে আমি রসিকের বৌয়ের সামনে যেতে চাই না। একদিন উপর থেকে জল ফেলেছিলাম। রসিক-গিন্নীর রোদে মেলে দেওয়া ভিজে কাপড়ে নাকি সেই জলের ছিটে-ফোঁটা একটু লেগেছিল। চিৎকার করে শাসিয়ে বলেছিল—আর একবার জল ফেললে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে আমায় ওপর থেকে নিচেয় ফেলে দেবে।

হয়তো সে পারেও। একদিন নাকি ঝগড়া করে উপর থেকে ঠেলে ফেলে দেবার উপক্রম করেছিল রসিককে। তারপরেই রসিক নিচের তলার বাসিন্দা। রসিক হাসতে হাসতে কথাটা একদিন বলেছিল আমায়।

পা টিপে টিপে প্রতিদিনকার অভ্যাস মত উপরে উঠলাম। ঘরে ঢুকে দেখি সোমা।

সোমা জানে কেমন করে বাঁদিকের জানালায় হাত গলিয়ে দরজা খুলতে হয়। একটু অসুবিধে হয় তার মোটা হাতের জন্য। এজন্য সোমার দুঃখ কম নয়। মোটা আর কালো বলে তার দরদস্তুর করে বিয়ে হচ্ছে না। বিয়ের বাজারে অমন কনের চাহিদা কম। তিন ভাইবোনের মধ্যে সোমা বড়। মা বেঁচে নেই। লেখাপড়া সে বেশিদূর করে নি। না করলেও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। অসাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের দ্বারা সে সব জিনিসেরই একটা চমৎকার তাৎপর্য খুঁজে পায়। কোন প্রশ্নই তার কাছে জবাবহীন থাকে না।

নিজে কালো বলে কোনদিন দুঃখ প্রকাশ কিংবা হা-হুতাশ করে নি। শুধু কালো আর মোটা বলে সুন্দর আর সুদর্শন মেয়ে-পুরুষ সম্পর্কে তার নিদারুণ অশ্রদ্ধা। আমার রোগা আর ঢ্যাঙা চেহারার প্রতি সোমার অশেষ করুণা এবং সহানুভূতি। ও কথা প্রসঙ্গে একদিন আমায় বলেছে—তোমার একটি বন্ধু প্রয়োজন রবীন। যে দু'হাতে তোমায় ঝড়ের মধ্যে ধরে রাখতে পারে!—কথা বলার সময় চোয়াল ফুলে ওঠে সোমার। আমার কাছে যা স্পষ্ট নির্ভীক ও দৃঢ়তার ছায়া বলে মনে হয়।

চেয়ারে বসে সোমা সোয়েটার বুনছিল। এবার শীতকালে ওর জন্মদিনে ও আমায় উপহার দেবে। আমার জন্মদিনেই দেবার ইচ্ছে ছিল সোমার। কিন্তু আমার জন্মদিনের তারিখ আমার জানা নেই।

সুখবর, রবীন।—আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই সোমা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।—সেই কখন থেকে তোমার জন্য বসে আছি।—হাত মুখ ধুয়ে নাও, বলছি।

সোমা আর অপেক্ষা করে না। পাশের ঘরে ঢোকে। যেখানে আমি রান্না করি। কিছু পরে এক প্লেট খাবার আর এক গেলাস জল রাখল টেবিলে। বিকেলে এসে সোমা এগুলি তৈরি করেছে। যেদিন বিশেষ কোন উত্তেজনাপূর্ণ খবব থাকে, সোমা সোজা আমার বাসায় চলে আসে। খাবার তৈরি করে। আমাকে খাওয়ায়। কিন্তু ও নিজে কিছুই খায় না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সোমা খুব নিস্পৃহ।

খবরটি এমন কিছু নয়। কিছুদিন ধরে সোমা আমাকে সঙ্গে নিয়ে পুরী যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এতদিন হয়ে ওঠে নি। আজই বাবার সম্মতি পেল সোমা। সেই সঙ্গে কিছু টাকাও।—আর তারই জন্য সোমা এত উচ্ছ্বসিত। এক নিশ্বাসে পুরো একমাসের মতো প্রোগ্রাম বলে যায় সে। যা লিখে মুখস্থ না করলে মনে রাখা অসম্ভব।

ছুটির ব্যবস্থা করে রাখবে রবীন। দিন ঠিক করে কাল পরশু তোমায় জানাব।—কেমন?' সোমা উঠে দাঁড়াল। আমার মতামতের অপেক্ষা না করেই। সোমা জানে তার কথার ওপর আমার কোন কথা থাকতে পারে না। সোমা এজন্য ভারি খুশি। সে নিজেই—তার মনের মতো স্বপ্ন গড়ে; আবার ভাঙে। সেখানে বাধা দেবার কেউ নেই।

তবু কিন্তু মাঝে মাঝে সোমা আমার মতামতের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষুব্ধ হয়; জ্বলে ওঠে। কিন্তু সে স্বল্প সময়ের জন্য। আবার মনে মনে শান্তি অনুভব করে। হোক না কেন আমার প্রতিবাদহীন মৃত আত্মসমর্পণ। তবু আত্মসমর্পণ তো বটে! সোমার কালো মোটা উপেক্ষিত যৌবন আমার কাছে নিশ্চিন্ত। এই নিরাপত্তাই বা রূপে বিড়ম্বিতা নারীর পক্ষে কম কি!

সোমা বিদায় নিল। যাবার সময় তার সঙ্গে বড় রাস্তা অবধি যাই। আগে যেতাম না। সোমা মেয়েদের সঙ্গে ভদ্রতা প্রকাশ করার আদব-কায়দা শিখিয়ে দেবার পর যেতে হয়।

ফিরে এসে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির মুখে রসিকের বৌয়ের সঙ্গে দেখা। ধক্ করে বুকটা লাফিয়ে উঠল। মনে পড়ল সোমা যখন প্রথম আমার কাছে আসা-যাওয়া শুরু করে তখনকার কথা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে লক্ষ্য করত আমাদের। অমন ভয়ঙ্কর চাউনি আমি খুব কমই দেখেছি।—

এসব ঢলাঢলি চলবে না বাছা। এটা গেরস্ত ঘর। বাড়াবাড়ি করলে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দোব—। একদিন আমাকে পথের মাঝে এমনি করে শাসিয়েছিল। সেই দুর্দান্ত চরম-বাণী শোনার পর থেকে দিন তিনেক ঘুম হয় নি। খেতে পারি নি ভাল করে। সোমা তারপর নিজে গিয়ে দেখা করে তার সঙ্গে। দু'জনের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছে—আমি জানি না। কিন্তু সেই

থেকে রসিকের বৌ আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। তবু ভয় কাটে নি আমার।

শুনুন।—ওর মোটা আর কর্কশ কণ্ঠস্বর আমার বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা মারল যেন।—আপনাদের বিয়ে কবে হচ্ছে?

আস্তে জবাব দিই—পনেরোই।

ঠিক হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। টেলিগ্রামে তাই জানলাম। গলার স্বর যতটা সম্ভব মোলায়েম রাখি।

টেলিগ্রাম!—কিসের টেলিগ্রাম? একরাশ বিস্ময় ওর চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে।

তীক্ষ্ণ প্রশ্নে ঘাবড়ে গিয়ে ওর দিকে তাকালুম। ক্ষুদে চোখজোড়া যেন জ্বলছে। তাতে দলা পাকান সন্দেহ। বুঝলাম আমারই ভুল হয়েছে। আজকের সকাল বেলাকার টেলিগ্রামের বিষয় ওর জানার কথা নয়।

তখন নিজের ভুল শুধ্‌রে নিতে বিনীতভাবে বাবার টেলিগ্রামের কথা বললাম তাকে।

কথা শেষ হওয়ার পরেও হাঁ করে চেয়ে থাকল সে। বেশ কিছু সময়। যেন আমি ভিন্নভাষী। আমার বক্তব্য তার বোধগম্য হয় নি। অথবা আমি ভিন্ন গ্রহবাসী। জীবনে যাকে এই প্রথম দেখলে। ক্রমে ক্রমে তার চাউনির পরিবর্তন হল। সে দৃষ্টি সহ্য করার মতো চোখের জোর আমার নেই। তীব্র তীক্ষ্ণ জ্বালাময়।

আমি মাথা নিচু করলাম। মুহূর্তে দড়াম শব্দে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমার মুখের উপরই। আকস্মিকতায় তখন আমি হতভম্ব। হঠাৎ কী ঘটে গেল আমি আন্দাজ করতে পারলুম না। কিন্তু পরক্ষণেই খেয়াল হল—পথ পরিষ্কার। কোন কিছু না ভেবেই উপরে উঠে গেলাম এক দৌড়ে।

পরদিন অফিসে পৌঁছতে একটু দেরি হল। সহকর্মীদের আজ অনেকেই অনুপস্থিত। শহরের সেরা দু'টো ফুটবল দলের আজ ফাইন্যাল খেলা। গীতাও আসে নি। একটা চিঠি পাঠিয়েছে : রবীনবাবু, আজ কিন্তু আর আসছি না। শরীরটা বড্ড ম্যাজ ম্যাজ করছে। আমার কাজগুলো জমে গেল। কী যে করি! আপনি সেরে রাখবেন কি? বড্ড উপকার হয় তাহলে।....গতকাল সিনেমা একদম ভাল লাগে নি। রাবিশ্।....ভাল কথা, একদিন আমার সঙ্গে আপনার সিনেমায় যেতে হবে কিন্তু। গীতা।

গীতার টেবিলের স্তূপীকৃত কাগজপত্র আমার টেবিলে নিয়ে এলাম।

সারাটা দিন কোথা দিয়ে যেন কেটে গেল। নিশ্বাস ফেলবার পর্যন্ত অবসর পেলাম না। দিনটা ছিল ভাপ্সা আর গুমোট। যেখানে বসে আমি কাজ করি সেখানে ইলেকট্রিক পাখা নেই; টানা পাখা। যে লোকটা পাখা টানে সে আজ বেঞ্চে বসে ঘুমাচ্ছে। কতকগুলি মাছি উড়ে উড়ে পড়ছে তার মুখে চোখে কপালে। ওর গায়ে জামা ছিল না বলে বুকের হাড়গুলো বিশ্রী দেখাচ্ছিল। জামা গায়ে থাকলে ওকে দেখতে মন্দ লাগে না। ও বেশ মজার লোক। সারাদিন পাখা টেনে যায়। মুখে একটি কথাও নেই। টানা পাখায় ওর শির বের করা শীর্ণ হাত গিঁঠ দিয়ে বাঁধা। যাতে খুলে না যায়। একই নিয়মে পাখা দুলতে থাকে। কোন এক অদৃশ্য শক্তি ভিতর থেকে ওর হাতের ওঠা-নামায় শক্তি জোগায়। ম্যানেজারের ঘরে যে-ইলেকট্রিক পাখাটা ঘোরে—সেটাও এমনি এক অদৃশ্য শক্তির নিয়মে চলে নিশ্চয়ই।

কিন্তু আজ আর টানা পাখাটা তেমন নিয়ম মেনে চলছে না। বার বার থেমে যাচ্ছে। ইলেকট্রিক পাখা থেমে গেলে তার মিস্ত্রী আসে। যন্ত্র খোলে; ঝাড়ে, পোঁছে, পরীক্ষা করে। এটা লাগায়,

ওটা বদলায়। আমারও একবার এই শীর্ণ রক্তশূন্য আর নির্বাক বোতামটা টিপে দেখতে ইচ্ছে হল।

ওর কাছে গেলাম। গায়ে হাত লাগাতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সুখু। অচল পাখা সচল হল আবার। এবং খুশি মনে আবার টেবিলে এসে বসলাম আমি।

কাজ শেষ হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। প্যাকেটগুলো ডেসপ্যাচের জন্য পাঠাবার আগে শেষবারের মতো পরীক্ষাও সমাপ্ত।....ডেসপ্যাচ সার্টিফিকেট লাগিয়ে দিলাম। শেষরাতে মালগুলো লরীতে উঠবে। এখন আমি উঠবো।

হঠাৎ একটা শব্দ হল। চেয়ে দেখি সুখু বেঞ্চ থেকে ঢলে নিচেয় পড়ে গেল। হাতের কব্জিতে বাঁধা দড়িটাও ছিঁড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। খোঁটায় বাঁধা গরু পালিয়ে যাবার আগে যেমন করে দড়ি ছেঁড়ে।

দারোয়ান শব্দ পেয়েই ছুটে এল। টেনে ওঠাল সুখুকে। বুকে হাত দিল। মুখে, নাকে, হাতে, পিঠে। উঠিয়ে বসিয়ে টেনে নামিয়ে চিৎকার করে সে এক হুলস্থুল ব্যাপার। ভয়ার্তস্বরে বলে উঠল—বাবু, সুখু মারা গেছে।

মৃত্যু শব্দটা স্পষ্টভাবেই কানে এল। কিন্তু চট্ করে সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না। শব্দটি বানান করার চেয়েও দারোয়ানের অনায়াস উচ্চারণ কিছুক্ষণ নিষ্ক্রিয় রাখল আমাকে।

তারপর দারোয়ানের অনুকরণে আমিও তার গায়ে হাত দিলাম। মুখে বুকে হাতে পিঠে। উঠে বসালাম। আবার পড়ে গেল। গাল থেকে ফেনা বেরিয়ে মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়িতে আটকে শুকিয়ে গেছে। সে এক অদ্ভুত রূপ!

এখন কি করব বাবু? দারোয়ানের ভয়বিহ্বল কণ্ঠস্বর কানে এল। মনে হল কিছু একটা করা চাই।

—কিন্তু কি করা যায়?

চোখের সামনে মানুষ মরতে আমি দেখি নি। মা মারা গেছেন অনেককাল। সে-কথা অস্পষ্টভাবেও মনে নেই। দিদি মারা যাবার সময় আমি মামাবাড়ি। ছোট ভাই যখন মারা গেল তখন আমার জ্বর। তাই চোখের সামনে এই মৃত্যু আমার মনে তেমন বিশেষ কোন অনুভূতির সৃষ্টি করল না। না দুঃখ না প্রশ্ন না বিহ্বলতা। বরং মনে হল ওর বেঁচে থাকা আর ঢলে পড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই ওর দাড়িভর্তি আর চুপ্সে যাওয়া মুখে কোন পরিবর্তন চোখে পড়ল না আমার। যখন ও বেঁচেছিল তখনও কোনদিন ওর হৃৎস্পন্দনের ওঠানামা বুঝতে পারি নি। মরার পরেও সে সব আমার কাছে একই রকমের স্তব্ধ। এতকাল এত-কাছাকাছি বসে থেকে, বেঁচে থেকে, অস্তিত্বের সামান্য সংকেত পর্যন্ত দেয় নি সে। আজই বা দেবে কেন ?

ডান হাতখানা হাতের মুঠিতে উঠিয়ে নিলাম। কব্জির পাশে একটা কালো দাগ। টানা পাখার দড়ির যে-বাঁধন ওর হাতের কব্জিকে বেঁধেছিল এ তারই জীবন্ত স্বাক্ষর। হঠাৎ আমার মনে হল—সুখুর জীবন আর মৃত্যুর চেয়ে এই কুৎসিত মোটা দাগটা বেশি সত্যি বেশি প্রখর বেশি উজ্জ্বল। একবার একটি মরা গরু কাঁধে বয়ে ফেলেছিলাম। তারও দেহে এমনি দাগ ছিল। সেটা গলায়। আর এটা হাতে। পার্থক্য শুধু এইটুকু।

দারোয়ানের হতভম্ব ভাবটা কাটাতে সময় লাগল। ও খুব ভয় পেয়েছে। এখন ও যে কি করবে তাই বুঝে পাচ্ছে না। বোকার মতো হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি উৎসাহের সঙ্গে সুখুকে নিরর্থক পরীক্ষার ভনিতা করছি।

ও ভাবল ওর বাবু নিশ্চয়ই একটা উপায় বলে দেবে। কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। হয়তো তার

জিজ্ঞাসার কোনও জবাব সেখানে ছিল না। উঠে দাঁড়াল। বলল, ম্যানেজারকে খবরটা দিয়ে আসি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ বললাম। কিন্তু ওর মনঃপূত হল না। মাথা চুলকে বলল—মরা মানুষটিকে রিক্‌সা করে বাড়ি পৌঁছে দিতে। তাতেও সম্মতি দিয়ে বললাম যে আমার আপত্তি নেই। একখানা রিক্‌সা ডাকার ব্যবস্থা করা হোক।

এবারও সে মত বদলাল।

আপনি দাঁড়ান বাবু। আমি ওর বাড়ি খবর দিয়ে আসি।

দারোয়ান সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল বেশ ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই। আমি সুখুর আটপৌরে মৃতদেহটা নিয়ে একাকী দাঁড়িয়ে। এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। চা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে এখন। কিন্তু উপায় নেই। চায়ের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। অফিস বাড়ির উল্টো দিকে সুইমিং ক্লাব। একদিন সোমা আমায় নিয়ে গিয়েছিল। আমাকে সঙ্গে করে সাঁতরাতে তার খুব ইচ্ছে। কিন্তু সেদিন পারি নি। আমার সর্দি হয়েছিল বলে। শেষ অবধি একাকী সাঁতার কেটেছিল সোমা। উপরে বেঞ্চে বসে আমাকে তারিফ করতে হয়েছিল তার সাঁতারের ভঙ্গিমা। সুইমিং ক্লাব থেকে সুরেলা বাজনার শব্দ ভেসে আসছে।

দারোয়ান ফিরে এল। সঙ্গে দুই রিকসা ভর্তি লোক। সুখুর বৌ ছেলেমেয়ে আর বিধবা বোন। সংখ্যায় ওরা সাত। সুখুর বড় ছেলের বয়স বছর পনের। ছোটটি মায়ের কোলে। মা কাঁদছে, দেখাদেখি ছেলেমেয়েরাও। সুখুর বিধবা বোনটি স্তব্ধ। সে বোধহয় আন্দাজ করতে পারছে না—কি ঘটে গেল! ওদের বিচিত্র স্বরের সমবেত কান্না বেশিদূর যেতে পারল না। সুইমিং ক্লাবের কন্‌সার্ট তখন পুরোমাত্রায়। কান্না আর বাজনা

তখন আমার কানে পৃথক হয়ে ধরা পড়ছে না। দুইয়েরই যেন উৎসভূমি এক।

আমি বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। সুখুর বৌ সহসা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার পায়ে। রোগা আর মাছকাটা ছাইয়ের মত তার চেহারা। শির বের করা হাতে আমার পা আঁকড়ে ধরে জানতে চাইল—এখন তাদের কি হবে?

"এখন তাদের কি হবে"—শব্দটি মনে মনে উচ্চারণ করলাম বারকয়েক। কোনও অর্থ খুঁজে পেলাম না। পৃথক পৃথকভাবে হয়তো এর এক একটা অর্থ আছে। কিন্তু একসঙ্গে কোনও অর্থ নেই। বিজ্ঞের মত বার কয়েক মাথা নাড়লাম আমি। বৌটি ভাবল আমি বোধহয় তার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছি। হাঁ করে চেয়ে রইল আমার দিকে। যেন ওর সকল প্রত্যাশা পূর্ণ করার মতো সামর্থ্য আমার মধ্যে বর্তমান।

দারোয়ানকে হাঁক দিলাম। আমাদের অফিসের বিলমাস্টার বিল খুঁজে না পেয়ে পিওনকে যেমন হাঁক দেয়। দারোয়ান সামনে এসে দাঁড়াতেই জানতে চাইলাম—এখন তাদের কি হবে?

কিছু সময়ের জন্য আমি, দারোয়ান, সুখুর বৌ স্তব্ধ। মা কান্না থামাতে বাচ্চাগুলোও চুপ করেছে। মৃতদেহ সামনে নিয়ে আমরা যেন এক গূঢ় তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় রত।

বিলমাস্টারের মত পায়চারি করলাম বার কয়েক। বিল না পাওয়ার খেলা খেলছি যেন। ওরা দু'জন সভয়ে আমার দিকে তাকিয়ে। এই মুহূর্তে হয়তো চিৎকার করে ওদের আমি কোন পথের সন্ধান বাৎলে দেব।

আমার যেন এক ধরনের নেশা চেপে গেল। পায়চারি বন্ধ করতে ইচ্ছে হল না। ওদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আমার প্রতিটি পদক্ষেপে সাগ্রহে ধরে রাখতে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম আমি।

দারোয়ান কাছে এগিয়ে এল। বলল যে ওরা এখন বাড়ি চলে যাক। কাল যা হয় করা যাবে।

তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে সম্মতি দিলাম—তাই যাক।

ওরা চলে গেল।

অফিস বাড়ি এখন মৃত বলে মনে হচ্ছে আমার। হয়তো এতক্ষণ মৃতদেহের সঙ্গে সহবাস করে অফিসটি মরে গেছে। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম। আজ আকাশ পরিষ্কার। আজ সমস্ত তারাগুলোই দৃশ্যমান। খিদে পেয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে একটা হোটেলে ঢুকে পেট ভরে খেয়ে নিলাম আমি। খাবার খেতে বসে মাংসের হাড় চিবোবার সময় হঠাৎ সুখুর মৃতদেহের বিশ্রী চেহারাটা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হো হো শব্দে হেসে উঠলাম।

বলদ-চেহারার একজন খদ্দের আমার পাশে বসে গো-গ্রাসে খাচ্ছিল। আমাকে অকারণ হাসতে দেখে কৌতুকবোধ হল তার। কেন হাসছি জানতে চাইলে—তাকে বললাম। সঙ্গে সঙ্গে সে গম্ভীর হয়ে গেল। এবং খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে চলে গেল সে।

বাসায় ফিরে বিছানায় শুতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময় রসিক উপস্থিত।

কি ভায়া! এমন সুখবরটি চেপে গেলে যে?—হেঁয়ালি দিয়ে কথা শুরু করল রসিক। তার কথার বেশি অংশের অর্থ বুঝি না। রসিক কিন্তু আমার অজ্ঞতায় সন্দিহান। ও আমার ভাবলেশহীন চেহারা দেখে আমাকে বিজ্ঞ বলে মনে করে। এবং আরো উৎসাহে হেঁয়ালির পর হেঁয়ালি চালায়। বেঁটে খাটো মানুষ রসিক। গায়ের পোড়া রঙে এক ধরনের মসৃণতা। চোখের দৃষ্টিতে পায়রার সরলতা। ছোট চোখজোড়ায় এমন একপ্রকার দৃষ্টি ঘুরে বেড়ায়, যা দেখলে মনে হয় পৃথিবীতে সে অজাতশত্রু। ও চোখে ক্রোধ মানায় না। ঘরের কার্নিসে-বসা পায়রার মত শান্ত সরল আর নিরুদ্বিগ্ন। শহরের বড় বড় বাড়ির উদ্ধত শীর্ষ রচনায় রসিক যখন ব্যস্ত তখন

রাজমিস্ত্রী রসিককে চেনাই দায়। অন্তত বার তিনেক আমার ভুল হয়েছে। ওর ঠোঁটে আর হাতে ফুটে ওঠা দৃঢ় প্রত্যয় আমার মনে নিরুচ্চার সম্ভ্রম জাগায়। ইঁটের পর ইঁট সাজিয়ে সে গড়ে তোলে ছোট মাঝারি লম্বা বাঁকানো ঢেউ খেলানো বাড়ি। কত ঢঙের! কত রঙের!

রসিকের কথা শুনে বুঝলাম সে টেলিগ্রামের খবর শুনেছে।

ওকে কিছুই বলতে হল না। ও নিজেই বকবক করে বকে চলল। —দু'টো বৌ থাকবে ভায়া। একটা ঘরের। অন্যটি মনের। ঘরের বৌ ঝগড়া করবে। 'তর্ক করবে। দাবি করবে। প্রয়োজনে ভাগও বুঝে নেবে সে।—তাতে ঘাবড়ে যেও না।—আর মনের বৌয়ের ওসব বালাই নেই। সে মনের সঙ্গে কথা বলবে; যে কথা অন্যের অগোচর। একজন প্রয়োজনের দাবি নিয়ে পেল্লায় চিৎকারে গলা ফাটায়; অন্যজন প্রয়োজনের পাশ কাটিয়ে গান শোনায়। আ! কী মজা! একজন করবে ঘর-কন্না। অন্যজন মন-কন্না!

রসিকের রসিকতায় জবাব দিলাম না। বিয়ে অথবা গৃহিণী সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু ভাবি নি। অবশ্যি এ কেবল বিয়ের প্রশ্নই নয়; জীবনের প্রায় প্রতি ব্যাপারেই আমি সিদ্ধান্তহীন। সব কিছুই আমার কাছে খাপছাড়া আর অসংলগ্ন বলে বোধহয়। তাই জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পূর্ব-পরিকল্পনা, ছক্-কাটা, চিন্তা-ভাবনার দায় থেকে নিজেকে মুক্ত রাখি সব সময়।

আরও কিছু সময় কথা বলে রসিক ক্লান্ত হল। সে চলে যেতেই আমি শুয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে রোদ এসে পড়েছে। রসিক নিয়ম মতো চা দিয়ে গেছে। ঠাণ্ডা জল

হয়ে গেছে চা। নীচেয় নেমে এলাম। বাইরে বেরুবার মুখে রসিকের বৌয়ের মুখোমুখি।

উপরের ঘর ছেড়ে দিতে হবে।

রসিকের বৌয়ের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর কানের ভিতর থেকে সোজা আমার বুকের মধ্যে আঘাত করল। আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে তার দিকে তাকালাম। স্থির আর কঠিন চোখের দৃষ্টি সহ্য করার মতো শক্তি ছিল না আমার। ওই দৃষ্টির অর্থ করাও সহজ।—অর্থাৎ উপরের ঘর আমাকে ছেড়ে দিতেই হবে।

মুখের ওপরই দরজা বন্ধ হয়ে গেল আবার।

যত সময় অপিসে কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে না পেয়েছি, তত সময় যেন রসিক-গিন্নীর চোখের দৃষ্টি আমাকে পিছন পিছন ধাওয়া করেছে। আমি গীতার টেবিল থেকেও জমে যাওয়া কিছু কাজ তুলে নিলাম। আজ গীতাকে চমৎকার লাগছে। মানানসই শাড়ি পরনে। কপালে টিপ্। রঙ-করা-তুলতুলে ঠোঁট। ঘাড় অবধি কেয়ারী-করা চুল। আমার দিকে চেয়ে একবার হাসল। একবার হাই তুলল আলতোভাবে। তারপর আমার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বলল—বিনুর কথা পেয়েছি রবীনবাবু।

ওর কথা অনুসরণ করতে গিয়ে চোখে চোখ মেলাতেই গীতা আরও মিষ্টি করে বলল ২৭শে আমাদের বিয়ে। নেমন্তন্ন থাকল কিন্তু আপনার।

সঙ্গে সঙ্গে বাবার টেলিগ্রামের কথা মনে পড়ল।

ছুটির দরখাস্ত লিখে ম্যানেজারের ঘরে পাঠালাম। আজ আর বাধা দিল না গীতা। বস্তুত বাধা দেবার মতো কোন অবসর যেন নেই তার। ছোট্ট একটা স্বপ্ন বুকে নিয়ে সে ঝলমল করছে। মুখের হাসি আজ যেন অফুরন্ত। আজ তার কাজের ব্যাপারেও কোন আলসেমী নেই। অপিস ছুটির পরেও সে কিছু সময় কাজ করল।

বাসায় ফিরে দেখি সোমা বসে আছে। আমি ঘরে ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়ালো।

তোমার সঙ্গে কথা আছে রবীন।

সোমার কণ্ঠস্বর আমাকে বিস্মিত করল। এমন গাঢ় আর ভারী গলায় সে কোনদিন আমার সঙ্গে কথা বলে নি। সোজাসুজি চোখ রাখলাম তার দিকে।

এটা কি ?

সোমার প্রশ্নে মুখ থেকে দৃষ্টি ঘুরে গেল তার হাতে। সোমার হাতে বাবার টেলিগ্রাম।

কোন কিছু বলার আগেই উত্তেজনায় ফেটে পড়ল সোমা। —এ সব কি ?....আমার সঙ্গে এমন ছলনা করতে কে তোমাকে অধিকার দিয়েছিল ?—কেন বলো নি যে তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে রয়েছে ? কেন এতকাল মিথ্যে আশ্বাস আমায় দিয়ে রেখেছিলে ? কেন ? কেন ?....

এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো 'কেন' আমার সামনে ছুঁড়ে মেরে সোমা ভেঙে পড়ল খাটের ওপর। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে তার মাংসল মুখ ভিজিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ আমি কেমন যেন হতবুদ্ধির মতো হয়ে পড়লাম। ওর অভিযোগগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে পারলাম না। অবাক হয়ে তখন তার কান্না দেখছি। অত বড়ো মোটা দেহের বাঁকে বাঁকে বোধহয় অজস্র জলস্রোত। বাঁধ মানছে না কিছুতেই।

কোন কিছু সিদ্ধান্ত না করেই আস্তে সোমার পিঠে হাত রাখলাম। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে সরে গেল। তারপর আর দাঁড়াল না। একদৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। আমাকে একটি কথা বলার অবসর না দিয়েই। যদিও ওর অতগুলো 'কেন'র জবাব দেওয়া আমার পক্ষে তখন দুঃসাধ্য ছিল।

আমি ওর পিছন পিছন নেমে আসতে উৎসাহ পেলাম না। বরং

এইভাবে সোমার নাটকীয় প্রস্থান আমাকে স্বস্তি দিল। আমি খাটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম। পাশের বাড়ির রেডিয়ো থেকে হিন্দী গানের চড়া সুর ভেসে আসছে।

সোমার কথাগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম বার কয়েক। বেশ লাগল, তবে কথার চেয়েও মনোরম তার কান্না। কেমন সুন্দর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ছন্দ—তাল—যতি বজায় রেখে সোমা কাঁদল। সেদিন কিন্তু সুখুর বৌ এত সুন্দর কাঁদতে পারে নি। সোমা কান্নার আর্ট জানে নিশ্চয়ই।

কিছু পরে রসিক এসে বসল।

চোরাবালিতে পড়ে গেছ বন্ধু! এখন সামলে উঠতে বেগ পেতে হবে।—

প্রতিদিনকার মতো আজও আমি নিরুত্তর রইলাম। ওর হেঁয়ালী করে কথা দুর্বোধ্য হলেও ভাল লাগে। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন সে হেঁয়ালী করে কথা বলে। ও জবাব দিয়েছিল ঠোকাঠুকির হাত এড়াতে। প্রমাণস্বরূপ তুলে ধরল একটি ইঁটের সঙ্গে অন্য ইঁটের যোগাযোগে সিমেণ্ট বালির হেঁয়ালীর কথা। ওর নিত্য কাজ সংযোগ। হোক না কেন ইঁটে ইঁটে। তবু বিয়োগ নয়।

অনেক সময় বসে গল্প করল রসিক। কিন্তু স্পষ্ট করে সোমার বিষয়ে কিছু বলল না। এই কিছু আগে সোমা কেঁদে কেটে এখান থেকে চলে গেছে এর আভাস ও পেয়েছে—এটা স্পষ্ট। অথচ সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্য কথার জাল বুনে চলল সে।

এক সময় রসিক একটা মোড়ক বাড়িয়ে দিল আমার হাতে। খুলে দেখলাম দামী ধুতি পাঞ্জাবী। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাতেই ও হেসে বলল যে, আমার এই বিশ্রী আর ঢ্যাঙা চেহারায় ভালো জামা কাপড় পরলে তবু যদি শ্রী খোলে একটু।

নইলে এমন হাড়গিলে শ্রীহীন চেহারা দেখলে বিয়ের পিঁড়িতেই মুর্চ্ছা যাবে কনে।

রসিকের হাসি আর পাইপের ধোঁয়ায় ঘর তখন জমজমাট।

এক সময় রসিক জানতে চাইল যে সোমার সঙ্গে দেখা হলে তাকে কিছু বলতে হবে কিনা।

আমার জবাব দিতে দেরি হচ্ছে দেখে সে বুঝল আমি কথা খুঁজে পাচ্ছি না। হেসে বলল, ঠিক আছে। যা করণীয় তা আমি করব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

মনের মধ্যে এক ঝলক স্বস্তির আলো ছড়িয়ে পড়ল যেন।

নীচে থেকে ভেসে এল রসিক-গিন্নীর কণ্ঠস্বর। ভাগ্য আর ঈশ্বরকে সমানে সে অভিসম্পাত দিয়ে চলেছে। যে ঈশ্বর তার সঙ্গে শত্রুতা করে রসিকের মতো অমন একটি অপদার্থ লোকের সঙ্গে জীবন মিলিয়ে দিয়েছেন।

রসিক উঠে দাঁড়াল।

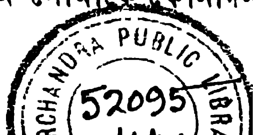
আমি এখন চলি ভায়া। আমার জন্য ঈশ্বর ভদ্রলোকটি আর কত গাল-মন্দ খাবেন।

দরজা অবধি গিয়ে ফিরে এসে বলল—একদিন যদি ঈশ্বর ভদ্রলোকটিকে সামনে পেতাম, তাহলে জিজ্ঞেস করতাম তোমার সৃষ্টিতে আমার মতো এমন ক'টি ঝকমারী তৈরী করেছ?—হো হো শব্দে হেসে ফের বলল—তিনি কি জবাব দিতেন জান? দিতেন—আমার হিসেবের খাতায় তুমিই প্রথম—আর—তুমিই শেষ।

হাসতে হাসতে নীচেয় নেমে গেল রসিক।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সহসা ঘুম এল না।—সোমা উচ্চারিত 'ছলনা' শব্দটি বার কয়েক আমার মনে পড়ল। বুঝতে পারলাম না সোমা কেন এ-কথাটি বলল। সে আমাকে 'ছলনা ও আশা দেখিয়ে প্রতারণার' অভিযোগ করে গেল। অথচ আমি সোমাকে কোনদিনই আশা



দেখাই নি। বরং সে নিজেই আমাকে আশার কথা অহরহ শুনিয়েছে। সে নিজের খুশিতে এঁকেছে আমাদের ভাবী যৌথ জীবনের মনোরম ছবি,—আমি সেই ছবির নিরুত্তাপ দর্শক মাত্র।

প্রায় তিন বছর পরে বাড়ি ফিরছি। কিন্তু সেজন্য মনের মধ্যে কোন চাঞ্চল্যবোধ করলাম না। সারারাত ট্রেনে ঘুমাতে না পেরে শরীরটা খারাপ লাগছিল। ট্রেন থেকে নেমে তিন মাইল রাস্তা হেটে এলাম রীতিমত বিরক্তি নিয়ে।

বাড়ি ঢুকতেই বাবার সঙ্গে দেখা। কি একটা কাজ বোঝাচ্ছিলেন কিষানকে। আমি বাবাকে দেখে থমকে দাঁড়াতেই আমার ওপব একবার চোখ বুলিয়ে জানতে চাইলেন যে, টেলিগ্রাম আমি ঠিকমতো পেয়েছিলাম কিনা। তারপর জিজ্ঞেস করলেন ট্রেনে ভিড় ছিল কেমন। প্রশ্ন দুটির কোনটিরই জবাব দিলাম না। স্বভাবতঃ এসব প্রশ্ন কোন জবাব প্রত্যাশা করে না। একতরফা প্রশ্নের মজা এইখানে।

বাবা পুনশ্চ বললেন—যাও, বিশ্রাম কর।

বাবা স্বল্পভাষী। নিম্নস্বর। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা কিংবা অহেতুক কণ্ঠস্বর বাবা পছন্দ করেন না। জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবের কাজ করে করে তাঁর মুখে পড়েছে রস-কষহীন কাঠিন্যের ছাপ। নায়েব হিসেবে তাঁর নাকি খুব নাম-ডাক। আমি কোনদিন হাসতে দেখিনি বাবাকে। একবার গাঁয়ের নিতু বৈরাগী পূজায় পাঁঠাবলি দেখে কেঁদেছিল। তাই দেখে মুচ্‌কি হেসেছিলেন বাবা। আমার সেই দুর্লভ দৃশ্যের কথা আজও মনে আছে। মাকে স্মরণ নেই। তাই জানিনে মার সামনে বাবা হাসতেন কিনা।

আমার জন্যে বাইরের ঘরখানা ঠিকঠাক করে রাখা হয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে এই ঘরেই রাত্রিবাস করে এসেছি আমি। একাকী।

মায়ের কোলে ঘুমোবার সুযোগ ঘটেনি বেশিদিন। বাবাও কাছে নিয়ে ঘুমানো অপছন্দ করতেন। বলতেন পুরুষ চিরকাল পৃথিবীতে একা। তাই তার একলা শোওয়াই উচিত।

মনে আছে একদিন রাতে বড় ভয় করছিল। একলা বিছানায় শুতে পারছি না। পাঠশালায় যাবার পথে আমার এক সহপাঠী ভূতের গল্প শুনিয়েছিল। সেই ভূতটা যেন আমার বিছানার আশে-পাশে ঘুরছে, এমনি মনে হচ্ছিল তখন। না পেরে বাবার বিছানায় গিয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি আমি আমার নিজের বিছানায়। তারপর আর কোনদিন রাতে একলা বিছানায় ভয় পাইনি।

ঘরখানা সবে পরিষ্কার করা হয়েছে। শোবার খাটখানা একেবারেই নড়বড়ে। বাবা খাটখানা বাতিল করেননি বলে আমার আনন্দ হল। পুরনো আসবাবপত্র বিক্রী কিংবা ত্যাগে বাবার খুবই অনীহা। নিস্পৃহভাবে সেগুলি আঁকড়ে রাখাই তাঁর স্বভাব। দেওয়ালে টাঙানো ধূলিধূসর একটা ছবি। ছেলে বয়স থেকে শুনে আসছি ওটা আমার তিন বছর বয়সের প্রতিকৃতি। ও ছাড়া আমার এ-পর্যন্ত আর কোন দ্বিতীয় ছবি নেই। ছবির প্রায় অর্ধেকটাই সাদা হয়ে গেছে।

দুপুরে বাবার সঙ্গে খেতে বসলাম। তখন সামান্য দু'চারটি কথা হল তাঁর সঙ্গে। তাও সংক্ষিপ্ত ; ছাড়াছাড়া। 'শহরে জমির দাম কেমন' ; কিংবা 'সোনা-রূপার দাম বাড়ছে – না কমছে' এই ধরনের মামুলি আর কাটাকাটা প্রসঙ্গ। বাবার এ ধরনের কোন প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারলাম না। সংস্কৃত ব্যাকরণের মতো দুর্বোধ্য মনে হল। বাবাও বোধহয় প্রত্যুত্তর প্রত্যাশা করেননি। মুখস্থ বলার মতো নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলেন। এ সব ব্যাপারে বাবা আমার চাইতে অনেক বেশি অভিজ্ঞ।

বিকেলে মাঠে যাবার আগে বাবা আমার ছুটির কথা জানতে চাইলেন।

—তোমার ক'দিন ছুটি ?

—সাতদিন।

—এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন বাবা। তারপর গম্ভীরস্বরে বললেন—তোমার বিয়ের তারিখ পিছিয়ে গেছে। পরশু বিয়ে।

বাবা মাঠে চলে গেলেন। বাড়িতে আমি একলা। পঞ্চানন কোথায় বেরিয়ে গেছে। গ্রামে বেড়াতে যাবার মতো কোন জায়গা নেই। বাড়ির মধ্যে পায়চারি করলাম কিছু সময়। সন্ধ্যা হয়ে এল। ম্লান গোধূলির আলো ক্রমশঃ অন্ধকারে ঢেকে যেতে লাগলো। দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে বসলাম। সামনে খোলা মাঠ। মৃদু হাওয়া বইছে। শেয়াল ডেকে উঠল পিছনের বাগানে। এক সময় সামনে এসে বসলেন বাবা।

অনেকসময় ধরে দুজনে মুখোমুখি বসে। একেবারে নিশ্চুপ হয়ে। অন্ধকারে কারো মুখ দৃশ্যমান হচ্ছে না বলে কোন কথা খুঁজে পাচ্ছি না কেউ। অথবা ভাষা জানিনে পরস্পরের। আমি অনুভব করছিলাম প্রথমে কথা বলার দায়িত্ব আমার। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও দায়িত্ব পালনের উপায় জানা ছিল না আমার। বস্তুত প্রথম কথা বলায় দায়িত্ব অনেক। আর সেটা পালন করতে এক ধরনের কুশলতা থাকাও দরকার। যা আমার একেবারেই নেই। দীর্ঘকাল ধরেই আমি শ্রোতা। এবং শ্রোতা বলেই জবাবদিহির বালাই নেই আমার। অনেকে এজন্য আমাকে বিজ্ঞ মনে করে। এর মধ্যে এক ধরনের দার্শনিকতার আভাসও খুঁজে পায়।

—শহরে কি কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত করেছ ?—এক সময় কথা বলার দায়িত্ব পালন করে বাবাই আমাকে রক্ষা করলেন।

ওঁর প্রশ্ন ঠিক বোধগম্য হল না আমার। চুপ করে বসে রইলাম আমি।

গ্রাম ছেড়ে একবার যখন বেরিয়েছ—তখন গ্রামে আর ফিরবে না বোধহয় ? আবার বাবার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। আধপোড়া বাসি রুটির মতো স্বাদহীন আর রসশূন্য।

এ প্রশ্নেও আমি নীরব।

—তাই ভাবছি বিয়ে করে বৌমাকে নিয়ে তো চলেই যাবে। কিন্তু এতো বড়ো বাড়িটায় একলা থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ছোট্ট, চাপা অথচ স্পষ্ট।

বাবার কণ্ঠস্বর আমার কাছে অপরিচিত বলে মনে হল। সম্ভবতঃ আমরা কেউ কাউকে চিনি না। অথবা অনেকদিন না শুনে ঠাওর করতে পারছি না সঠিকভাবে। আমি নিঃশব্দে বসে রইলাম।

ইতিমধ্যে অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে। বাবার ছায়া-মূর্তিটাও আমাব কাছে আর স্পষ্ট নয়। চারদিকে ভয়ানক নিস্তব্ধ। মনে হচ্ছে এখানে কোন প্রাণ নেই। সবই মৃত। কিংবা মানুষের পৃথিবী থেকে ছিটকে এসে পড়েছি এক অপরিচিত শীতল গ্রহে।

মজুমদার বাড়ির রাঙা-বৌ পরদিন সকালে এসে হৈ চৈ বাঁধালেন। কাল এ বাড়ির একমাত্র ছেলের বিয়ে। অথচ আজ সকাল অবধি তার কোন প্রস্তুতি নেই। গাঁয়ে অল্প কয়েক ঘর লোকের বাস। তারা পর্যন্ত অ-নিমন্ত্রিত। এটা কিছুতেই হতে পারে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাবার স্বভাবই এই। তিনি কৃপণ নন। প্রয়োজনে অর্থব্যয়ে তাঁর জুড়ি নেই। অথচ সামাজিক বিধিবিধানগুলি তাঁর কাছে আশ্চর্যভাবে উপেক্ষিত। বিসদৃশ আর উত্তাপহীনভাবে কর্তব্য সম্পাদনে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বাড়তি উচ্ছ্বাস কিংবা অহেতুক দুঃখ প্রকাশ—দু'টোতেই তাঁর প্রবল আপত্তি।

এজন্য দুর্নাম আছে বাবার। দাম্ভিক অহঙ্কারী। বাবাকে

নিয়ে নিন্দার চালাচালি হয় প্রতিবেশীদের মধ্যে। অসামাজিক বলে বাবার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই তাদের মন বিমুখ। কিন্তু বাবার মনের জোর অসম্ভব। সব জেনেও তিনি তা মানেন না—যা তাঁর অনভিপ্রেত।

আমার বিয়ের ব্যাপারেও বাবা তাই করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়ালেন রাঙা-বৌ। বাবাকে দিয়ে প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করিয়ে, বরযাত্রী ঠিক করে, বাজনা বাজিয়ে ছাড়লেন। একমাত্র ছেলের বিয়েতে বাবার উচ্ছ্বাসপ্রবণ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এই হল তাঁর যুক্তি। বাবা তাঁর যুক্তির কাছে হার মানলেন।

রাঙা-বৌ আমাদের প্রতিবেশী। বিধবা হয়েছেন বিয়ের দু'বছরের মধ্যেই। সন্তানহীনা রাঙা-বৌ স্বামীর সম্পত্তি দেওর-ভাশুরের সঙ্গে বোঝাপড়া করে পৃথকভাবে বসবাস করছেন অনেককাল। এখন তাঁর বয়স চল্লিশের ওপর। অথচ দেখে বোঝা যায় না। বয়স অনুপাতে শরীর এখনও বেশ শক্ত আর মজবুত। চোয়ালে পড়েছে সংসারে আত্মীয়-বান্ধবহীন একলা চলার ছাপ। দেওর-ভাশুরেরা তাঁর ন্যায্য অংশের ওপর হাত দিতে চেষ্টা করেও পারেনি। জোরে মুঠি চেপে আঁকড়ে আছেন আজ তিরিশ বছর।

রাঙা-বৌ, টকটকে রাঙা চেহারা তাঁর নয়। বরং কালো, তবু আধময়লা চেহারাটা পুরুষ-পিষ্ট না হয়ে চকচকে আছে। জলগড়ানো স্যাঁতলা ধরা পাথরের মতো পিচ্ছিল আর শক্ত। এককালে তাঁকে নিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক গল্প, অনেক চোখ টেপাটেপি। অনেক ইশারা! রাঙা-বৌ ভয় পাননি কখনো। বরং কখনো হেসে কখনো ঝগড়া করে জবাব দিয়েছেন, মোকাবিলা করেছেন,—যতটুকু তাঁর সাধ্য। যে অবধি তাঁর সঙ্গতি কুলায়। আমি তাঁকে পিসি বলে ডাকি।

রাঙা-বৌ এসে কাজে হাত লাগালেন। বিয়ের স্ত্রী-আচার থেকে

সুরু করে বাবার খরচের হিসেব পর্যন্ত। মা বেঁচে নেই। বার বার দুঃখ প্রকাশ করলেন সে-কথা স্মরণ করে।

বাবা কিন্তু নির্বিকার। ছেলের বিয়ের আনন্দ-উৎসবে তিনি উচ্ছল হয়ে ওঠেননি একেবারেই। বিয়ের দিনই পাশের গ্রামের একটি জমি জোর করে দখল করলেন বাবা। দুপুর পর্যন্ত তাঁকে বাড়িতেই পাওয়া গেল না।

তবে রাঙা-বৌকে কোন কাজে বাধাও দিলেন না বাবা। মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে বাবাকে কখনও মুখর হতে দেখিনি।

বিয়ের দিন আমারও কোন কাজ ছিল না। সারাটা দুপুর শুয়ে-ঘুমিয়ে কাটালাম। অফিসে থাকলে এ-সময়টা ডুবে থাকতাম মালের আমদানি-রপ্তানি হিসেবের মধ্যে। কিংবা সোমা নিয়ে যেত যেদিকে তার খুশি। অথবা এমনি ভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতেও বাধা ছিল না। বস্তুত সময়ের দাস আমি। ঘটনার স্রোতে ভেসে বেড়ানোই আমার স্বভাব।

যে-গ্রামে আমার বিয়ে সন্ধ্যার মুখে নৌকা করে পৌঁছলাম সেখানে। সামান্য কয়েকজন বরযাত্রী। কয়েকজন আলো হাতে নদীর ঘাটে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। নৌকা থেকে নামতেই হুলুধ্বনি আর শঙ্খধ্বনি করে নিয়ে গেল আমায়। পুরনো একটা বৈঠকখানায় ওরা আমাকে বসতে দিল। ঘরের দেয়ালে নানা ধরনের বিচিত্র দাগ। লাল-নীল-সাদা কাগজে ফুল কেটে আর নক্‌শা বানিয়ে সাজান হয়েছে তারই মধ্যে। দেয়ালে টাঙানো ঝকঝকে কয়েকটি ছবি। যা এই ঘরের মধ্যে বে-মানান। হয়তো আজকের রাতের জন্যে ধার করে আনা হয়েছে।

চারদিক থেকে আপ্যায়ন আর অচেনা চোখের সকৌতুক দৃষ্টি আমাকে ঘিরে ধরল। আমি আজ সকলের মধ্যমণি। একবার শহরে বাঁদর নাচ দেখেছিলাম। কি জানি কেন—হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই দৃশ্যের কথা।

বিয়ের লগ্ন সাতটায়। অনেকক্ষণ সাতটা বেজে গেছে। অথচ বাড়ির ভিতর থেকে কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। বাবা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বরযাত্রীদের মধ্যে বয়স্কজনেরা পরস্পর কি যেন পরামর্শ করলেন। ফুটফুটে মেয়ে দু'টো আমাকে বাতাস করা বন্ধ করেছে বেশ কিছুক্ষণ। লক্ষ্য করলাম এত সময় জানালা-দরজার ফাঁক দিয়ে যে দৃষ্টিগুলো আমাকে ঘিরে রেখেছিল তা আর নেই। হঠাৎ মনে হল চারিদিক কেমন চাপা আর থমথমে আবহাওয়া। দু'চারজন লোকের ফিসফিসানি, চাপা তর্ক। মুখ বাড়িয়ে দেখা আর সরে যাওয়া। বাবাকে রীতিমতো অস্থির দেখাচ্ছে।

আচমকা বাড়ির ভিতরে সোরগোল উঠল। 'পাওয়া গেছে—পাওয়া গেছে—'। চিৎকার করে কেঁদে উঠল কেউ। সঙ্গে সঙ্গে চাপা ধমক 'চুপ—চুপ'।

উঠে দাঁড়ালাম। বৈঠকখানায় এই মুহূর্তে কেউ নেই। পিছনের দরজা খোলা ছিল। অভিভূতের মতো ঢুকে পড়লাম সেই পথে।

একটা অন্ধকার ঘরের পাশ দিয়ে এসে দাঁড়ালাম উঠানে। সেখানে তখন একদল মেয়ে-পুরুষ গোল হোয়ে দাঁড়ান। তাদের মাঝখানে জলে-ডোবা একটি মেয়ে—জ্ঞানহারা। দু'তিন জন লোক আনাড়ির মতো তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করছে। পাশে বসে হাউ হাউ শব্দে কাঁদছে এক বুড়ী।

আমি ওদের সারিয়ে দিলাম। জলে-ডোবা মানুষের নার্সিং ওরা জানে না। স্কুলে পড়ার সময় শিখতে হয়েছিল আমাকে। চটপট অনুশীলন শুরু করে দিলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে মেয়েটির জ্ঞান ফিরল। গরম দুধ খাওয়ান হল তাড়াতাড়ি। চোখের দৃষ্টি শূন্য। একবার সেই দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে চোখ বুজল। কাছে বসে থাকা বুড়ীটা হেসে-কেঁদে তখন একাকার।

বহুশ্রমে ক্লান্ত সে। বোধহয় ঘুমাতে চায় এখন। ওকে ঘরে

নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল। বাইরে বেরিয়ে আসতেই বাবার শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠস্বর কানে এল আমার—খোকা, চলে এস।

বাবার দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠলাম। তার চোখজোড়া জ্বলছে—বৈঠকখানায় এস। রাত দু'টোর লগ্নে বিয়ে।

কথা শেষ করে বাবা কয়েক পা বাড়াতেই— ঘরের ভিতর থেকে প্রায় বিকৃত কণ্ঠে কেঁদে উঠল সেই মেয়েটি। সন্ধ্যায় যে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। -- না না। আমি বিয়ে করব না। ওগো! তোমরা আমাকে বাঁচতে দাও..........

আমি চমকে উঠলাম। বাবা থমকে দাঁড়ালেন। বাড়ির লোকজন রুদ্ধশ্বাস! হঠাৎ যেন সকলেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

কিন্তু এই অস্বাভাবিক অবস্থা বেশি সময় স্থায়ী হতে পারে না। ঘটনা যতই অপ্রীতিকর হোক যথাসম্ভব প্রীতিকর উপায় বের করতেই হয়। ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বৃদ্ধ লোক বাবার হাত দু'খানি ধরে কি সব যেন বললেন। দূর থেকে শোনা গেল না। আর শোনার ব্যাপারে আমার আগ্রহও ছিল কম। তবে কণ্ঠস্বর কানে এল। আমার বিয়ে তিনি এখানেই দেবেন, এবং সেটা আজ রাত দু টোর লগ্নেই সম্পন্ন হবে।

বাবা সাধারণত মৃদুভাষী। চীৎকার করে কথা বললেই গলা থেকে কয়েকটি সুর একসঙ্গে বেরিয়ে বিশ্রী শোনায়। বাবার সেদিকে খেয়াল নেই। হয়তো এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তাঁর পক্ষে সেটা রাখাও সম্ভব নয়। তাঁর কথা বলার দ্রুততা আর পারিপার্শ্বিক উত্তেজনায় অনেকগুলি কথা দুর্বোধ্য ঠেকল। সেই বৃদ্ধকে তখন নিদারুণ অসহায় মনে হচ্ছে।

ঘরের ভিতর থেকে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এল সেই মেয়েটি। সটান আমার পায়ের ওপর। পা দু'খানি সজোরে চেপে ডুকরে কেঁদে উঠল সে।—আমায় বাঁচতে দিন। আমি বিয়ে করবো না। কিছুতেই না।

সব মিলে দৃশ্যটি আমার কাছে উপভোগ্য। আমার ভাবী স্ত্রী কাঁদছে—সে আমাকে বিয়ে করবে না। বাবা উত্তেজনায় কাঁপছেন—বিয়ে তিনি এখানে দেবেনই। দরজায় মুখ চেপে বুড়ীটা দাঁড়ান, কথা বলার মতো কিছু নেই তার। উঠানভর্তি লোকজন রুদ্ধবাক; ঘটনার অস্বাভাবিক প্রচণ্ডতায় বিমূঢ় হয়ে পড়েছে তারা।

এক পলক দেখে নিলাম আমি। সোমার সঙ্গে একদিন একটা হিন্দী সিনেমায় হুবহু এমনি এক দৃশ্য দেখেছিলাম। তবে সেটা ছিল আরো জমজমাট; আরো চোখ ঝলসান; আরো গুরুগম্ভীর।

চলে এসো খোকা—; বাবার নির্মম কণ্ঠস্বরেব অপ্রতিরোধ্য ডাক কানে এলো।

এদিকে মেয়েটিও আমায় ছাড়বে না। কথা তাকে দিতেই হবে। নইলে এইখানে মাথা খুঁড়ে সে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে।

উঠানভর্তি লোকজনের নিস্পলক দৃষ্টি আমার মুখের ওপর। হঠাৎ মনে হল আমি যেন বিচারক। এই মুহূর্তে এদের মরা কিংবা বাঁচা যে-কোনও রকম শাস্তি দিতে পারি। মাত্র একটি ইঙ্গিতের অপেক্ষা। এদের সকলকেই এখন আমার কৃপার পাত্র বলে মনে হচ্ছে।

এ অবস্থা বেশিক্ষণ বহন করা কঠিন। এমনি দমবন্ধ করা মুহূর্ত, অন্তত আমার পক্ষে। কিছু একটা করতেই হবে।

কিন্তু কি করতে হবে?

হঠাৎ এই প্রশ্নের মুখোমুখি পড়ে সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। চট করে বুঝে পেলাম না এখন ঠিক কি করা দরকার। কি করলে এর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। —এ শুধু আজকের বলে নয়। এমন অসহায় আমি অনেকবার অনেক রকমে হয়েছি। এমনি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পেরে, ঘটনার কাছে আত্মসমর্পণ করে রেহাই পেয়েছি তখন।

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে ঘটনা কই?—যা আমাকে ঠেলে নিয়ে

যেতে পারে একটি সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত পরিণতিতে। এখানে সব কিছুই অনড় অচল। যেন ঘটনাকে চলমান করার দায়িত্ব একমাত্র আমার।

সকলের মুখের দিকে তাকালাম।

সকলেই উন্মুখ। উদ্‌ভ্রান্ত। আমার জবাবের প্রত্যাশায় সকলেই যেন নির্বাক। মুহূর্তের জন্য এই পরিবেশ কঠিন আর শীতল বলে মনে হল।

হঠাৎ সেই অসহনীয় নৈঃশব্দ ভেদ করে মেয়েটির কান্না মেশান কণ্ঠস্বর কানে এল—ওগো! তোমরা আমাকে বাঁচতে দাও। আমি বিয়ে করব না।

এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ দিয়েও কয়েকটি শব্দ বেরিয়ে এল—না, আমি আর বিয়ে করব না।

হঠাৎ কি যেন ঘটে গেল। আমার কথা শেষ হতে না হতেই একদৌড়ে ঘরে চলে গেল মেয়েটি। বুড়ীর মুখে একগাল হাসি আর চোখে একরাশ জল। হাতের লাঠি ছুঁড়ে বাবা বেরিয়ে গেলেন। উঠানভর্তি মেয়ে-পুরুষের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। সেই বুড়োলোকটি বাবার পিছু পিছু ছুটে গেলেন দু'টি হাত জোড় করে।

আমার ক্ষণপূর্বেরও অভাবিত একটি কথা আচম্‌কা এতগুলি লোকের মধ্যে এমন বিচিত্র অনুভূতি জাগাবে আমি সেটা আন্দাজ করতে পারিনি। ক্ষোভ, ক্রোধ, আনন্দ ও মুক্তির চাঞ্চল্য। মানুষের বিভিন্ন ও বিপরীতধর্মী হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ। আমি বিমূঢ় হয়ে পড়লাম।

কিছু সময়ের মধ্যেই বিয়েবাড়ির বাজনা থেমে গেল। আলো নিভে গেল। লোকজন চলে গেল একে একে। মেয়েটির ঘরের দরজা বন্ধ রয়েছে লক্ষ্য করলাম। বোধহয় চূড়ান্ত উত্তেজনার পর এখন নিদারুণ অবসাদে ঝিমোচ্ছে।

শুধু একটা কুকুর চোখে পড়লো—উঠোনের এককোণে একলা শুয়ে। মনে হল আমরা দু'জন যেন পরস্পরের খুব কাছাকাছি।

পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলাম। এ-পথ আমার চেনা নেই। সন্ধ্যাবেলায় আমাকে চিনে আসতে হয়নি। এখন কিন্তু চিনে যেতে হবে। তবে সেজন্য কোন দুঃখ বোধ হল না। অথবা মহৎ কাজ করতে পারার আনন্দও অনুভব করলাম না আমি। বস্তুতঃ মেয়েটির অসংবৃত চেহারা আমার কাছে ভাল লেগেছিল। ভয় পেয়েছিলাম বাবার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে। তবু আমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হল আজকের ঘটনা-প্রবাহ। যার ওপর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না আমার। তাই বিয়েবাড়ি থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে জনমানবহীন নদীর তীরে একলা দাঁড়িয়ে আমার মনের মধ্যে কোন বৈরাগ্যবোধ জন্মাল না। কেবল থেকে থেকে অদ্ভুত এক কৌতুকবোধ আমাকে সচকিত করতে থাকল। সচরাচর যার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

* * * *

পরদিন বাড়ি ফিরতে দেরি হল।

বাবা বাড়ি নেই। পঞ্চানন চা নিয়ে এল।

বাবু ভীষণ রেগে গেছেন দাদাবাবু।—ফিস ফিস করে কথা বলল পঞ্চানন।—জেদাজেদি করে বাবু তোমার বিয়ে দিচ্ছিলেন। মাঝখানে পড়ে তুমি বাবুর মুখখানা ছোট করে দিলে।

স্বভাবতঃ বাবার নির্বিকার চেহারাই আমার কাছে বেশি পরিচিত। বেশি স্পষ্ট। ছেলেবেলা থেকেই বাবাকে দূরে দূরে রেখেছি। যখনই মুখোমুখি হয়েছি, তখনই রেখাচিহ্নহীন নিরুত্তাপ দৃষ্টি তাঁর চোখে ফুটে উঠেছে। যা সইতে পারিনি। দ্রুত চোখ নামিয়ে নিয়েছি। বাধ্য হয়েছি মুখ ঘুরিয়ে নিতে। এমন অর্থশূন্য আবেগহীন চোখ-মুখ সহ্য করা কঠিন।

বাবাকে আড়াল থেকে একটিবার দেখতে ইচ্ছে হল। ভীষণ রেগে গিয়ে এখন তাঁর চোখ মুখের চেহারায় কি পরিবর্তন হয়েছে,

কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে তার পরিমাপ করতে ইচ্ছে হল যেন। কিন্তু সারাদিনের মধ্যে বাবাকে বাড়ি পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আজও তেমনি অন্ধকার। প্রথম দিন বাড়ি পোঁছে যেমন দেখেছিলাম। চারদিক তেমনি শব্দহীন মনে হল। মৃত আত্মা যেন অনড় হয়ে এখানে পড়ে আছে। পৃথিবী যে সচল এবং অনবরত জীবনময়, একথা এখানে মনে করার উপায় নেই। একরাশ অন্ধকার বুকে করে আমাদের বাড়িটি মরার মতো অচৈতন্য। এর মাঝে বসে আমি নিজেকে জীবন্ত বলে মনে করতে পারলাম না। নাড়ি টিপলাম। বুকে হাত রেখে পরীক্ষা করলাম। মাথা নাড়লাম। চিমটি কাটলাম নিজের হাতে বুঝতে চাইলাম এতবড় এক বিরাট ব্যাপক সর্বগ্রাসী মৃত্যুর মধ্যে আমি বেঁচে আছি কিনা!

ক্রমশঃ আমার চেতনা আচ্ছন্ন হতে থাকল। আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম একটা দড়ি এনে কেউ যেন আমায় বেঁধে ফেলেছে। তারপর কালো কাপড় দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে ফেলল। চিৎকার করার মতো যৎসামান্য চেষ্টাটুকুও যেন আমার মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই। তখন আমার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে।

অস্পষ্ট এক শব্দ আমার চেতনায় ঘা দিতে থাকল। আস্তে আস্তে চোখ খুললাম। ততক্ষণে অন্ধকার কিছুটা ফিকে হয়ে গেছে। নারকেল গাছের মাথার ওপর সপ্তর্ষিমণ্ডল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

শব্দটা ঝিমান। থেমে থেমে চেপে আসছে। অনেকটা যেন রাত-জাগা পাখির কান্নার সুর।

আস্তে আস্তে বাড়ির ভিতর ঢুকলাম।

হাতে আলো নেই। উঠানে দাঁড়িয়ে শব্দের আন্দাজ করলাম কিছু সময়। একবার মনে হল কান্না। আবার মনে হল গোঙানি। তারপর মনে হল কান্না ও গোঙানি দুই-ই।

শব্দ লক্ষ্য করে পায়ে পায়ে বাবার ঘরের কাছে এসে দাঁড়ালাম।

দরজা বন্ধ। বারান্দায় হুঁকো-কল্‌কে। কিছু আগে তামাক খেয়েছেন বাবা।

শব্দটা থেমে গিয়েছিল। আবার উঠল। মনে হল বাবার ঘরের পিছনে কেউ গোঙাচ্ছে। পিছন দিকে শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলাম।

পিছনের দরজাটা আধখোলা। হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় ঘরের ভিতরটা খুব স্পষ্ট নয়। লক্ষ্য করলাম বাবা তাঁর রাঙা-বৌ-এর কোলে মুখ গুঁজে শুয়ে আছেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছেন এক একবার। আর রাঙা-বৌ পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন তাঁকে। দরজার দিকে পিছন ফিরে রাঙা-বৌ বসেছিলেন। পিঠের ওপর কাপড় নেই। বাবার একটা হাত তাঁর কোমর ঘিরে রয়েছে। আমি একদিন এক বর্ষার সন্ধ্যায় এমনিভাবে সোমার কোমর জড়িয়ে ধরে শুয়েছিলাম। সে আমার চুল বিনিয়ে দিচ্ছিল আর স্বপ্নের কথা বলছিল।

বাবা কি যেন বললেন। তাঁর মৃদু কণ্ঠস্বরের জন্য কথাটি আমার কানে এল না। জবাবে মাথা নাড়লেন রাঙা-বৌ। তারপর বাবার কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন বারকয়েক। সন্তর্পণ সোহাগের ভঙ্গিমায়। তাঁর মাথার চুল পিঠ বেয়ে মাটিতে লোটাচ্ছে।

বাবা এবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। কপালে হাত রাখলেন। সরিয়ে দিলেন রাঙা-বৌ।

—এখন ঘুমাও তো....। রাঙা-বৌ যেন আদেশ করলেন বাবাকে।

—ঘুম আসছে না রঙিল....।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরলেন বাবা। রাঙা-বৌকে রঙিল বলে ডাকতে বাবাকে আজ প্রথম শুনলাম।

—হেরে গেলাম রঙিল ! ভাঙা কণ্ঠস্বরে বাবা যেন কেঁদে উঠলেন। আমার হার হয়ে গেল।

হ্যাঁ আসলে।—গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি।

—না। তুমি কোনদিন হারোনি। হারতে পারো না। দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন রাঙা বৌ। এখন ঘুমাও।

রাঙা-বৌর মাথায় কাপড় নেই। প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থা। ঢেউ খেলান একরাশ চুল। ঘরের ম্লান আলোয় তাঁকে মনে হচ্ছে এক যৌবন-উন্মাদ ষোড়শী।

প্রায়-নিবন্ত আলোটি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতেই ঘর গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল।

পরদিন বাবার সঙ্গেই খেতে বসলাম। বিয়ের রাতের সেই ঘটনার পর বাবার সঙ্গে এই প্রথম মুখোমুখি হলাম আমি।

আমার রীতিমতো অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল। বাবা যদি সে-রাতের প্রসঙ্গে কোন কথা বলেন আমি কি জবাব দেব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বারবার আড়চোখে বাবার মুখের দিকে তাকালাম। কোন রাগ অভিমান বা অভিযোগের সামান্য চিহ্নও খুঁজে পেলাম না আমি। বরং প্রথম দিন যেমনটি দেখেছিলাম ঠিক তাই মনে হল। তেমনি নির্বিকার। চাঞ্চল্যহীন গম্ভীর।

কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম। যদিও আমি জানতাম বাবা রাগ করবেন না। কারণ রাগ করার মতো সঙ্গত কারণ নেই তাঁর। বিয়ে ঠিক করার মধ্যে যেমন আমার কোন হাত ছিল না, বিয়ে না হওয়ার ব্যাপারেও ঠিক তাই। পারিপার্শ্বিক ঘটনাস্রোত আমাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। দিক-নির্দেশ করার মতো শক্তি আমার আছে কি নেই সেটুকু ভেবে দেখার মতো উৎসাহ পর্যন্ত পাইনি। শহরের পিচ্ ঢালা রাস্তায় বিপুলাকার যে লরীগুলো দুরন্তবেগে ছুটে যায় তার চাকার মতো আমি শুধু ছুটেই চলেছি। কেউ যেন আমায় স্ক্রু নাট বল্টু দিয়ে আটকে দিয়েছে কতকগুলি ঘটনার সমষ্টির সঙ্গে। যে-সব ঘটনার আগে-পিছে কোন হাত নেই আমার।

তবে বাবাকে এসব কথা আমি বোঝাতে অক্ষম। কারণ বিষয়টি আমার মগজেই এখনো সুষ্ঠু আকার নেয়নি। তাই বাবা যদি এখন প্রকৃতই রেগে গিয়ে আমাকে কিছু বলেন—সেটা আমাকে মেনে নিতেই হবে।

নিঃশব্দে খাওয়া-দাওয়া চুকে গেল।

হাত-মুখ ধুয়ে উঠে আসব বলে প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময় বাবা জানতে চাইলেন আমি কবে ফিরে যাচ্ছি।

চোখ ওঠাতেই ফের প্রশ্ন করলেন—মানে, তুমি কি ছুটি শেষ হবার আগেই এখান থেকে চলে যাচ্ছ ?

মাথা নাড়লাম। 'হ্যাঁ', 'না' দুই-ই জবাব হতে পারে।

বাবা বোধহয় সেদিকে লক্ষ্য করলেন না। আস্তে আস্তে বললেন- কিছুদিন আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না। ভেবেছি এখন দিন কয়েকের জন্য বাইরে যাব।

একটুখানি থেমে—যেন দম নিয়ে বললেন, অবিশ্যি কোথায় যাব এখনো ঠিক করিনি। তবে যাব।

এ ধরনের আলোচনায় কোনদিন আমি অংশ গ্রহণ করিনি। সুতরাং নিয়মমাফিক জ্যামিতিক জবাব সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শোলার মতো হালকা আর বরফের মতো ঠাণ্ডা বাবার কথাগুলি আমার চারপাশে নৃত্য করল অনেকক্ষণ। আঁকড়ে ধরে রাখতে পারলাম না, বাবার চলে যাওয়া না যাওয়া আমার মতামতের ওপর নির্ভরশীল কিনা—সেটা জানা নেই। বাবাকে আমি কম চিনি। শহরের চীনা রেস্টুরেন্টে যে লোকটি খদ্দেরের বিল কাটে, বাবাব চাইতে সেও আমার বেশি চেনা। বাবাও হয়তো ততোধিক কম চেনেন আমাকে। এ অপরিচয়ের ব্যবধান সহজে অনুমান করা যায় না। ব্যাখ্যা করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু এর পরিমাণ অনেকখানি। সুতরাং শ্রোতা যেমন অপরিচিত বক্তার বক্তৃতা শোনে—নিঃশব্দে,

কিছুটা বিনা মন্তব্যে—তেমনিভাবে বাবার শব্দোচ্চারণ এমনকি দীর্ঘ-নিশ্বাস পর্যন্ত শুনলাম।

বাবা আর কথা বাড়ালেন না। এমন কি আমার মনোভাব বুঝবার জন্য চেষ্টাও করলেন না। নিঃশব্দে উঠে চলে গেলেন। বাবাকে আজ, এই মুহূর্তে খুব বয়স্ক বলে মনে হল।

পরদিন বিকেলেই রওনা হবার জন্যে তৈরি হলাম আমি।

দুপুরে খেতে বসে শুনলাম বাবা বাড়িতে নেই। সদর কাছারী গেছেন। সেখানে আজ একটা ভালো জমি নীলাম হচ্ছে। অনেক দিন থেকেই ওই জমিটার ওপর বাবার নাকি লোভ।

বাবার জন্যে অপেক্ষা করলে গাড়ি ধরতে পারব না। তাই তাঁর সঙ্গে দেখা না করেই ইস্টিশানের দিকে পা বাড়ালাম। যেমন নিঃশব্দে বাড়ি এসেছিলাম তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলাম বাড়ি থেকে।

ইস্টিশানে বাবার সঙ্গে দেখা হল আমার। কয়েক মুহূর্তের জন্য। যে-কামরায় আমি উঠলাম সেই কামরা থেকেই বাবা নামলেন। চোখের নিমেষে ঘুরে দাঁড়ালেন বাবা। ততক্ষণে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

বাবা ছুটে এলেন। কি যেন বললেন আমায়। গাড়ির হুইসিলের শব্দে বাবার কথা কানে এল না। জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালাম। গাড়ির গতি বাড়ছে। বাবা চলন্ত গাড়ির সঙ্গে ছুটতে ছুটতে হাত উঁচু করলেন। চিৎকার করে কি যেন বলে উঠলেন আমায়। এবারও আমার কানে এল না। আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেও গাড়ি থেকে নেমে পড়তে ইচ্ছে হল না আমার।

ক্রমশঃ ইস্টিশান একটা বাঁকের আড়ালে ঢাকা পড়ল। এবং আমার দৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেলেন বাবা।

সারারাত ঘুমিয়ে ঝিমিয়ে ট্রেনে কাটল। বাসায় যখন পৌঁছালাম তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। রসিকের খোঁজ নিলাম; ওদের ঘরে তালা ঝুলছে।

সোমা আসে না আজকাল। ঘরে ময়লা জমেছে প্রচুর। পরিষ্কার করতে ইচ্ছে হল না। হোটেল থেকে খেয়ে এসে ঘুমিয়ে কাটালাম সন্ধ্যে অবধি।

একটু রাত হতেই ঘর থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় চলতে শুরু করি। বিশেষ কোন লক্ষ্যস্থল অভিমুখে নয়। বলা চলে উদ্দেশ্য-বিহীন। হাঁটতে ইচ্ছে হচ্ছে—তাই হাঁটছি যেন।

রাস্তায় ভিড় কম। সিনেমা শো ভাঙেনি। কাফে-রেস্তোরাঁয়ও আজ লোকের ভিড় নেই।

হঠাৎ একটা রিক্‌শা আমার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। লাইট-পোস্টে হেলান দিয়ে আমার কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকা বোধহয় সে লক্ষ্য করেছে। সে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল এবং সম্ভবতঃ হাসল। তার হাসিতে আমিও অপ্রয়োজনেই যোগ দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মৃদুস্বরে বলল যে, সে আমাকে পৌঁছে দেবে।

লোকটির গায়ের রঙ আলকাতরার মতো কালো। একটু অগোছাল চেহারা। ছোট চোখজোড়ায় এক ধরনের হাসি খেলে বেড়াচ্ছে। যার প্রকৃত অর্থ বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব। এই নির্জন রাস্তায় ঐ চেহারা বেশ মানিয়েছে।

আমি তার রিক্‌শায় উঠে বসলাম।

রিক্‌শা ছুটল। আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করেই। যেন আমাকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ওরই—আমার নয়। যেন লক্ষ্য নির্বাচনের ভার ও নিজেই নিয়েছে। আমার শুধু যাওয়া।

কিছুদূর গিয়ে একটা গলির মোড়ে পৌঁছে সে তার ছোটা থামাল। সামনে পর পর কয়েকটি খাবারের দোকান। বিভিন্ন

বয়সের কয়েকজন খরিদ্দার। ওরা বেশ মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলছে। ওদের হাবভাব দেখে মনে হল ওরা সকলেই সুখী। রিক্‌শাওয়ালা আমার মুখের দিকে ফিরে তাকাল। হয়তো যাচাই করে নিতে চায় যে, সে ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছেছে কিনা। আমি কথা বললাম না। আমার স্বভাব-নিরুত্তাপ মুখ দেখে সে যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। কিন্তু সেও মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই চোখে-মুখে এক অদ্ভূত ইঙ্গিত করল সে। আমি সম্ভবতঃ তার ইঙ্গিতের ভঙ্গিমা অনুসরণ করে সায় দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তার ছোট চোখজোড়া কথা বলে উঠল যেন। তারপর আস্তে আস্তে তার রিক্‌শা ঢুকল গলির অপ্রশস্ত পথ ধরে। সেখানে আলো খুব কম।

গলির দু'পাশেই বাড়ি। গায়ে গা লাগান। কোন বাড়ির দরজা বন্ধ—একেবারে নিঝুম আর অন্ধকার। কোন বাড়ির দরজা-জানালা খোলা। গান আর বাজনার শব্দ ভেসে আসছে। দরজার রোয়াকে বসে একদল মেয়ে - তাদের কেউ বিড়ি টানছে। গান গাইছে। কিংবা হাই তুলছে কেউ। আমাদের দেখে সমস্বরে চিৎকার করে উঠল তারা। গেয়ে উঠল এককলি অশ্লীল গান। কে একটা খিলিকরা পান ছুঁড়ে মারল আমাকে লক্ষ্য করে। হি হি শব্দে হেসেই চলেছে কয়েকজন।

রিক্‌শা এক জায়গায় এসে থামল। ও বলল যে, আর নেই। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্ততঃ করল। তারপর নামতে বলল আমায়।

এইবার আমার লক্ষ্য কি ? রিক্‌শাওয়ালার দিকে তাকাতেই সে ভাড়া চাইল। বুঝলাম আমার প্রথম কর্তব্য ভাড়া মিটিয়ে দেওয়া।

পকেটে হাত দিয়েই চমকে উঠলাম। পয়সা নেই।

খুব সম্ভবতঃ সে আমার মুখ দেখে বুঝে নিয়েছে গোলমাল কিছু একটা ঘটেছে। তাই তাড়াতাড়ি আবার ভাড়া চাইল। এবার

তীব্র আর ঝাঁঝাল কণ্ঠস্বর। ওর লোমশ হাত দুটো ঘামে ভিজে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে যেন।

আমার এই বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করে সামনের বারান্দা থেকে একটি মেয়ে নেমে এল। রিক্‌শাওয়ালা ততক্ষণ আমার হাত ধরেছে, দু'একটি অশ্রাব্য বিশেষণ প্রয়োগ করেছে আমার পিতৃ-পুরুষকে উদ্দেশ্য করে। ত্বরিতে মেয়েটি ওর হাত ধরে একটু দূরে টেনে নিয়ে গেল। নিম্নস্বরে কথাবার্তা হল ওদের। আঁচলের গিঁট খুলে ভাড়া মিটিয়ে দিতেই চলে গেল সে।

ব্যাপারটি ভোজবাজীর মতো ঘটে গেল যেন।

আসুন।—মেয়েটি হাত ধরল আমার।

সম্মোহিতের মতো ডান দিকের অপ্রশস্ত বারান্দা পেরিয়ে ওর সঙ্গে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ও আমার হাত ধরে তার বিছানায় বসাল। হাওয়া করল। মুখের ঘাম মুছিয়ে দিল তার আঁচল দিয়ে। ও মৃদু মৃদু হাসছে। যেন আমাদের পরস্পরের অনেককালের পরিচয়।

আমার খুব ভালো লাগল। ওর কালো মুখে পুরু করে পাউ-ডারের প্রলেপ। ছোপ-ধরা ঈষৎ উঁচু দাঁত। বার বার বুকের কাপড় পড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে চোখ চেপে ধরছে আমার। যেন 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ' খেলা। হেসে লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। আমার গলা জড়িয়ে ধরে গান গেয়ে উঠল। বিশ্রী রকমের ভাঙা কণ্ঠস্বর। আমার সোহাগ আদায়ে ও যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

বস, আসছি।—ততক্ষণে সে আপনি থেকে তুমিতে নেমেছে। আমাকে ঠেলে সরিয়ে বাইরে গেল সে।

ঘরখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। অনেকগুলো ঠাকুর-দেবতার ছবি। লক্ষ্মী, গণেশ, কালী, মহাদেব। ও বোধহয় সব ঠাকুরকেই প্রণাম করে। খাটের পাশে একটি আধবয়সী মেয়ের ছবি। সম্পূর্ণ

উলঙ্গ। ফুলদানীতে বাসি ফুল। হয়তো কয়েকরাত আগে কেউ দিয়ে গেছে। আর পায়নি ; তাই ফেলতে পারছে না।

ও এল। হাতে চা আর ভাজা জাতীয় খাবার। খাটের নিচে থেকে প্লেট বের করে খাবার সাজিয়ে দিল আমায়। তারপর টুকটাক বের করল হিমানী পাউডার সুর্মা এসেন্স। নির্দয়ভাবে সে-সব ব্যবহার করল। চুল আঁচড়ে কপাল বের করল অনেকখানি।

খাও। কাছে বসে আপ্যায়ন করল আমায়। মৃদু হেসে আর বিনীত হয়ে বলল যে, তার কাছে টাকা নেই। তাই মদের ব্যবস্থা করতে পারল না। আমি টাকা দিলে ও আনাতে পারে।

আমার তরফ থেকে তেমন কোন সাড়া না পেয়ে ওর বোধহয় সন্দেহ হল।

টাকা আছে তো?

ওর কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত এক সুর বেজে উঠল চোখে অস্বাভাবিক দৃষ্টি। মুখে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার ছাপ।

আমার জবাব না পেয়ে উঠে দাঁড়াল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সে। চোখের সুর্মা আর মুখের পাউডার ভিজে একাকার।

পাশের ঘরে হারমোনিয়ামের একটানা সুর বেজে চলেছে। কোন মাতাল হারমোনিয়ামের রীড্ চেপে ধরে আছে বোধহয়।

ওর চোখের জল আমাকে বিব্রত করল। এখন এখানে বসে থাকা অথবা বেরিয়ে যাওয়া কোন্‌টি সঙ্গত হঠাৎ বুঝে পেলাম না। উঁচু জায়গা থেকে একখণ্ড পাথর ঠেলে দিলে সে যেমন গড়াতে গড়াতে অবশেষে এক জায়গায় এসে আট্‌কা পড়ে—আমার অবস্থাও ঠিক তাই। এই রাতে ঘর ছেড়ে পথে বের হওয়া, রিক্‌শাওয়ালার স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে এখানে পৌঁছে দেওয়া, এই কালো আধবয়েসী মেয়েটির

ঘরে ডেকে আনা এবং সামনে দাঁড়িয়ে হাসা আর কাঁদা—এর কিছুরই সঙ্গে আমার ইচ্ছার কোন সম্পর্ক নেই। অথচ সমস্ত ঘটনাগুলো একের পর এক কেমন সুন্দর ঘটে গেল। যেন প্রত্যেকটিই সাজান। পূর্ব-পরিকল্পিত। এগুলি গেঁথে গেঁথে একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি করা যায় ; – যে ছবির নায়ক আমি। কিন্তু ভূমিকা নিষ্ক্রিয়।

এমনিভাবে স্থাণুর মতো হয়তো অনেকসময় বসে থাকতাম আমি। যতক্ষণ না খুঁজে পেতাম আমার করণীয় কাজটি। কিন্তু বসে থাকতে হল না। ও আমায় উঠতে বলল। এবার ওর কণ্ঠস্বর দৃঢ় কর্কশ শান্ত বলে মনে হল।

বাইরে এসে দাঁড়ালাম আমি। পাশের ঘরে তখন হাসির একটানা হল্লোড়।

পরদিন অপিসে পৌছাতেই হৈ চৈ করে উঠল সকলে। একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন, অনেক কৌতুক, অনেক ঠাট্টা। এত বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করল যার জবাব দিতে কয়েকদিন দরকার। কিন্তু মজা এই যে, তারা জিজ্ঞেস করছে জবাবের পরোয়া না করেই। আমাকে ওরা কোন কথা বলার অবসর দিতে নারাজ যেন। নিঃশব্দ থেকে আত্মরক্ষা করলাম আমি। কেউ শুভেচ্ছা জানাল। কেউ উপদেশ দিল। অথবা ব্যক্তিগত জীবনের দু'একটি সরস উদাহরণ। এ সময়ে অন্য কেউ হলে আসল ঘটনাটি বলে ওদের চমকে দিতে পারত। কিন্তু আমি তখন রীতিমতো ক্লান্ত। তাই কিছু সময়ের হালকা রসিকতা মুখ বুজে মেনে নিলাম।

বিকেলের দিকে গীতা এল।

বৌ কেমন হল? পছন্দ হয়েছে তো? কৌতুক করে কাছে বসল।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলাম। ও আরও একটু কাছে এগিয়ে মৃদুস্বরে বলল, রোববার আমরা নতুন বাসায় যাব।

আপনার নিমন্ত্রণ রইল কিন্তু। আমার চোখের নির্বিকার দৃষ্টি অনুসরণ করে বলল, আমি আর বিনু ...।

কথা শেষ না করেই উঠে চলে গেল গীতা।

অপিস থেকে ফিরতে বেশ দেরি হল আমার। এ ক'দিনের অনুপস্থিতিতে যে কাজ জমেছিল একদিনে শেষ করা অসম্ভব। ঘরে গিয়ে জানালার কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। রসিক আজও ফিরে আসেনি। ওর এই স্বভাবের সঙ্গে আমি পরিচিত। হাতে টাকা জমতেই ও বেরিয়ে পড়ে। যেদিকে চোখ যায়, মন চায়। টাকা ফুরিয়ে গেলে ফিরে আসে। তার আগে নয়। অবশ্য এই বেড়ানোর ব্যাপারটি রসিকের বৌয়ের ইচ্ছাধীন। কথাটা রসিকই একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল। কিন্তু ওরা কোথায় যায় সেকথা ওরা বলতে নারাজ। রসিক বলে—নামের প্রশ্ন উঠলেই যাত্রীর বিচার শুরু হয়ে পড়ে। সে তীর্থযাত্রী কিংবা নিছক সখের যাত্রী সেটা মানুষের কাছে অপ্রকাশই থাকুক। কাজ কী - দু'টো গালগল্প তৈরি করার সুযোগ দেওয়ার। রসিক মাত্র একবার আমাকে সঙ্গে নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। বলেছিল তাতে নাকি আমার ভূতুড়ে জীবন মানুষ হবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত ইচ্ছা ইচ্ছাই রয়ে গেছে। রসিক-গিন্নী তাদের দু'জনের মধ্যে তৃতীয়জনকে জোটাতে নারাজ।

জেল গেটে রাত দু'টোর ঘণ্টা বাজতেই শুয়ে পড়লাম।

বাড়ি থেকে ফিরেছি এক সপ্তাহ। এর মধ্যে মনে রাখার মতো কোন ঘটনা ঘটেনি। একটানা নিস্তরঙ্গ জল যেন। আমার জীবনে কোন প্রবাহ নেই। আকাশের গায়ে রোজ সূর্য ওঠে। সারাদিন তাপ ছড়ায়। সন্ধ্যায় ডুবে যায়। রাত আসে। ফুরিয়ে যায়। অথচ অনবরত এক অনির্দেশ্য গতি মানুষকে, পৃথিবীকে, হয়তো এই সৌরজগতকে টেনে নিয়ে চলেছে। সেটা কোন্ লক্ষ্যে তা জানি না।

তবে লক্ষ্য একটা আছে নিশ্চয়ই। দূর উত্তর আকাশে দীপ্যমান নীল তারা অভিজিৎ অথবা অন্য কোন অচেনা অজানা জগৎ অভিমুখে আমাদের এই অবিরাম ছোটার সঙ্গে যেন কোন সম্পর্ক নেই আমার। আমি শুধু প্রতিদিনকার নিয়মে বাঁধা কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখি। এখানে আমার কাছে সবই সমান অর্থবহ। সমান অর্থ-শূন্যতায় পরিপূর্ণ।

তবু আগে সোমা আসত। এসে স্বাদ পালটাত, রং ফেরাত। উত্তেজনার সঞ্চার করত কিছুটা। বাড়ি থেকে ফিরে আসার পরে সেও আর আসেনি। একদিন দেখা হতেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। ঘৃণায় কিংবা অভিমানে বুঝতে পারিনি।

এর মধ্যে মাঝে মাঝে শরীরের ভিতর একটা দুঃসহ তাপ অনুভব করি। তখন জানালার কাছে বসে সিগারেট পোড়াই। আস্তে আস্তে বাড়ি-ঘর রাস্তা-পার্ক সব নিঝুম হয়ে আসে। সারাদিনের জনস্রোত কোথায় হারিয়ে যায়। প্রতিদিনকার কত বিচিত্র দুঃখ কষ্ট হাসি-কান্না ভালোলাগা মন্দলাগার সাময়িক পরিসমাপ্তি ঘটে। অবশেষে আমার সামনে পড়ে থাকে ভয়ঙ্কর অবসাদের স্থবির আচ্ছন্নতা। ক্লান্ত চোখজোড়া নিরর্থক ঘোরাফেরা করে। সে চোখ খুঁজে পায় না কিছুই। না দুঃখ—না—আনন্দ! না উত্তেজনা!

সকালে ঘুম ভাঙতেই নির্দিষ্ট জায়গায় চায়ের পাত্র দেখেই বুঝলাম যে, রসিক ফিরেছে।

মুখ-হাত ধুয়ে নিচেয় নেমে এলাম আমি। রসিক আজ কাজে যায়নি। একগাদা বই বের করে ঝেড়ে মুছে রোদে দিচ্ছে। এ ওর স্বভাব। মাঝে মাঝে বাক্স-বন্দী বইগুলির যত্ন নেয়। রাজ-মিস্ত্রীর জীবনে এত সব বই পড়ার সুযোগ কবে কখন কেমন করে এল এ কথার জবাব চাইনি কোনদিন। আর চাইলেও সে দেবে না। মাঝে মধ্যে এক আধজন লোক আসে রসিকের কাছে। দরজা বন্ধ করে ওদের মধ্যে আলোচনা হয়। আমার সামনেও একদিন হয়েছিল।

কিন্তু সে আলোচনা এত ভারী আর জটিল যে, একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি।

এস। রসিক আমাকে আসন বাড়িয়ে দিল। ধরাও—সিগারেট বাড়িয়ে দিল একটা।—তারপর বৌ কেমন হল?

আমি নিরুত্তর রইলাম।

বিয়ের ব্যাপারটা খুব মজার তাই না? রসিক জবাব না পেয়েই আবার শুরু করল। স্বাদ গন্ধ দুই-ই আছে। সঙ্গে আছে সিদ্ধির উত্তেজনা। যে নেশায় সারাজীবন বুঁদ হয়ে থাকা যায়। এই দেখো না;—রসিক একটা ফটো বের করল। এই ছোট মেয়েটিকে কতদিন আগে বিয়ে করেছিলাম। এখন সেই নেশায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ থেমে গেল। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেল যেন। বলল, আমার কথা থাক তোমার কথা বলো।

রসিক চুপ করল এবার। ওকে আজ যেন একটু গম্ভীর দেখাচ্ছে। কিছুটা বিষণ্ণ। আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হল। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম।

কখন অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়েছি খেয়াল নেই। সোমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালাম।

সোমা তাদের বাড়ির গেটে দাঁড়িয়েছিল। একটা অ্যালশেসিয়ানের শিকল ধরে। আমাকে দেখতে পেল কিনা বোঝা গেল না। একটু দ্রুততার সঙ্গেই চলে গেল।

ওদের দোতলা বাড়ি প্রায় নদীর কাছে। সোমার বাবা এন্‌জিনিয়ার। প্রচুর আয়। কিন্তু স্বভাবে কৃপণ। তাই বাবার ওপর সোমার অভিযোগ অন্তহীন। সংসারে সৎ-মা। সেখানে সোমার ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু সোমা সেজন্যে চোখের জল ফেলে না। দাবী আদায়ে তর্ক করে। সোমার বাবা যখন দ্বিতীয়-

বার বিয়ে করেছেন তখনই বিয়ের বয়স হয়েছে সোমার। তাই সোমা এখন মুক্তি চায়। সৎ-মাকে সোমা কোনদিন মা বলে ডাকেনি।—সোমাই আমাকে এ-সব কথা বলেছে।

অনেক সময় স্থাণুর মতো গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকার পর সোমাকে দেখে খেয়াল হল।

একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সোমা গেটের দিকে আসছে। আমি সম্ভাষণ জানাবার ভঙ্গিমায় ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম। ও মুখ ঘুরিয়ে নিল। আস্তে বলল, বাবা এখন বাড়ি নেই। কার্ড লিখে রেখে যেতে পারেন।

কথা বলতে বলতে ওরা কয়েক পা এগিয়ে গেল। সোমা বোধ-হয় ওঁকে বাসে উঠিয়ে দেবে।

সোমার হাঁটার ভঙ্গিমা বরাবরই ভালো। আজ যেন আরো ভালো লাগল। ও আগের তুলনায় কিঞ্চিৎ রোগা হয়ে গেছে। কথা বলার সময় আগের মতো শ্বাসকষ্ট টের পাইনি। ইচ্ছে হল সোমাকে পিছন থেকে আরো কিছু সময় দেখি। কিন্তু সময় হল না। একটা রিক্শায় উঠে ভদ্রলোকটির সঙ্গে চলে গেল সোমা।

আমি আর দাঁড়িয়ে না থেকে সোজা গিয়ে ঢুকলাম পার্কে। ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লাম। পরিষ্কার নীল আকাশ। অনেক উপরে কয়েকটি শকুন উড়ছে। মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছে। দম্‌কা গরম হাওয়া। এরই মধ্যে শহরটা যেন ঝিমোচ্ছে। যতদূর চোখ যায়—একজন পথচারীও দেখলাম না। শুধু একা আমি—নির্জন পার্কে চিৎ হয়ে শুয়ে চলমান জগতের সঙ্গে সম্পর্ক-হীন। নিঃসঙ্গ পথিক!

বাবা মারা গেছেন!

অপ্রত্যাশিত সংবাদ। এ খবরের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

তখন অপিসের টিফিন পিরিয়ড। ঘর ফাঁকা। একাকী আমি বসে আমদানি-রপ্তানির হিসেব মেলাচ্ছি। আজ ম্যানেজারের মেজাজ রুক্ষ। সকাল থেকেই তাই কাজের খুব চাপ। সকালের ডাকে আসা চিঠি তাই এতসময় পরে পড়বার অবসর মিলল।

রাঙাপিসি বাবার মৃত্যু-সংবাদ দিয়ে চিঠি লিখেছেন আমাকে। কখন কি অবস্থায় বাবা মারা গেছেন তার খুঁটিনাটি বিবরণ রয়েছে। সেই সঙ্গে একটানা শোক-প্রকাশ। মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু লিখতে হলে তার বিশেষ কৌশল জানা চাই। রাঙাপিসির সেটা আয়ত্তাধীন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তিনি সময় নিয়ে লিখেছেন। অনেক ভেবে- চিন্তে। অনেক হিসেব করে। জীবনভোর বাবা কি চেয়েছেন—আর পাননি—ওঁর চিঠিতে সেটা স্পষ্ট। বাবা শান্তি চেয়েছিলেন। কিন্তু পাননি। অংশতঃ সেজন্যে নাকি আমিই দায়ী। পুত্রের দায়িত্ব পালনে আমার উদাসীনতা বাবাকে নাকি মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে রাঙাপিসি লিখেছেন, "এ নিয়ে তোমার বাবার ক্ষোভ ছিল সত্যি, কিন্তু বাহ্যিক প্রকাশ ছিল না। বাইরের মানুষটিকে ছাড়িয়ে যে তাঁর ভিতরের মানুষটিকে দেখতে পেত সে-ই উপলব্ধি করতে পারত তার গভীরতা। আমি দেখতে পেয়েছিলাম। তুমি পারনি। তুমি তার একমাত্র সন্তান। একমাত্র পুত্র।"

চিঠি শেষ করার আগে পুনশ্চ দিয়ে একটা লাইন যোগ করেছেন, "বাবার প্রতি শেষ কর্তব্যটুকু অন্তত করো।"

চিঠি শেষ করতেই ম্যানেজারের ঘরে ডাক পড়ল আমার।

বাসায় ফিরতে রাত হল। মাথার মধ্যে কিলবিল করছে সারাদিনের কাজের কথা। ভালো করে স্নান করে শরীরের উত্তাপ দূর

করলাম। চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম জানালার কাছে। চিঠির কথা মনে পড়ল।

বাবার মৃত্যু-সংবাদ আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে। কেমন যেন হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনে। অবিশ্যি তাঁর বেঁচে থাকার বাস্তবতাও আমার বোধের অনায়ত্ত ছিল। আমার দৈনন্দিন কাজে তো বটেই—দৈনন্দিন চিন্তার এক ভগ্নাংশও তাঁকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়নি। কোথায় যেন বিরাট রকমের ফাঁক ছিল; বিশাল ব্যবধান। আকাশ এবং মাটির ব্যবধান। আমি গড়ে উঠেছি একাকী; একরাশ হাওয়ার এলোমেলো চাপে। তাই বাবার মৃত্যু-সংবাদ আমাকে বিচলিত করার সুযোগ পেল না। গতকাল সকালে সামনের মুদী দোকানের রঙীন সাইনবোর্ডটা পড়ে যাওয়ায় এর চেয়ে আমার মন বেশি বিচলিত হয়েছিল। বাবার মৃত্যু—এ যেন সকাল-বেলায় দৈনিক কাগজে পড়া অচেনা লোকের শোক-সংবাদ।

বাবা কি তাহলে আমার অচেনা?

হয়তো তাই। হয়তো কেন—নিশ্চয়ই তাই।

বাবা আমার অচেনা জগতের অপরিচিত মানুষ। চেনা-মহলের সামান্য পরিচয়টুকুও আমাদের পরস্পরের মধ্যে ছিল না। যেন রেল-গাড়ির দুই কম্পার্টমেণ্টের জানালার কাছে বসা যাত্রী দু'জন। বাইরে তাকাবার অবসরে দু'জনার চোখাচোখি পরিচয়। ওয়েটিং রুমে একে অপরকে দেখেছিলাম। দু'জনের পকেটে দু' ইস্টিশানের টিকিট।

রসিক এসে বসল। হাতে বার্মাই চুরুট। আমায় দিল একটা। তার বৌ বাসায় নেই। তাই নিশ্চিন্ত মনে অনেক রাত অবধি আড্ডা দিতে ওর বাধা নেই।

বৌ নিয়ে এস হে। বিয়ের পর একলা থাকতে নেই।

ওর কথায় মৃদু হাসলাম আমি।

কি ভাবছ? বৌকে এনে কিভাবে আমার সঙ্গে পরিচয়

করিয়ে দেবে—তাই ? হা হা শব্দে উচ্চৈঃস্বরে হেসে বলল—সে তোমায় ভাবতে হবে না। পরিচয় আমি নিজেই করে নেব।

বাবা মারা গেছেন। আমি আস্তে কথাটা উচ্চারণ করলাম।

এ্যাঁ !—রসিক চম্‌কে উঠল। বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। সে বিস্ময় হয়তো আমার মুখের স্বাভাবিকত্ব দেখে।

মুহূর্তের মধ্যে ঘরখানা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। রসিকের হাতে বার্মাই চুরুট আপনা আপনি পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় ও চুপ করে রইল। কি বলবে তা যেন বুঝে পাচ্ছে না। এমন সংবাদ ও আশাও করেনি।

এ অবস্থায় আমারও চুপ করে থাকা ছাড়া অন্য উপায় নেই। চেষ্টা করলাম মুখে-চোখে ক্লান্তি আর হতাশার চিহ্ন ফোটাতে। কিন্তু চোখের কোণে একফোঁটা জল পেলাম না। তাই অনন্যোপায় হয়ে মাথা নিচু করলাম।

রসিক মনে করল আমি গভীর আঘাত পেয়েছি। আর সে আঘাতের পরিমাণ গুরুতর বলে আমার মনে কোন চাঞ্চল্য নেই। তাই সে আস্তে আস্তে বলল যে, মৃত্যু সকলেরই একদিন অবশ্যম্ভাবী। সান্ত্বনা দিল যে, ও জন্যে ভেঙে পড়ে লাভ নেই। ভরসা দিল পরদিন আমাকে একজন ব্রাহ্মণের কাছে নিয়ে যাবে যিনি শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-কর্ম করে থাকেন।

নিস্তব্ধ ঘর। কারুর মুখে কথা নেই। অশরীরী এক অসাড় মনোভাব যেন আমাদের আচ্ছন্ন করল। আমি রসিকের সামনে বসে রইলাম গুরুতর এক বেদনার ভনিতা নিয়ে।

একসময় রসিক উঠে গেল। শুরুতেই ছেদ পড়ে গেছে। আজ আর তাকে জোড়া দেওয়া যাবে না। তাই কথা বলে ও আমার মনকে আরও ভারাক্রান্ত করতে চাইল না।

আমি তখন চেয়ারে বসে তন্দ্রায় ঝিমোচ্ছি।

পরদিন অফিস ছুটির পরে রসিক এল। আমি তখনও জটিল হিসেবে ব্যস্ত। আর কছু সময় কাজ করলে হিসেবের গড়মিল খুঁজে পাব।

এখন চল—। রসিক এসেই তাড়া লাগল। আমি আর দেরি করতে পারলাম না। খাতাপত্তর গুছিয়ে রেখে বেরিয়ে এলাম বাইরে। খিদে পেয়েছে খুব। সুইমিং ক্লাবের বিপরীত দিকে চীনা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। আমি জানতে চাইলাম কি খাওয়া যায়। রসিক জবাব দিল অশৌচে মাছ-মাংস খায় না।

অবিশ্যি এর কোন অর্থ নেই।—রসিক আবার মন্তব্য করল। খায় না—যেহেতু কেউ খায়নি। সিগারেট ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া হাওয়ায় ফুঁ দিয়ে ছাড়ল।

আমি মানিনে।—তুমি মানো নাকি? বিজয়ীর মতো প্রশ্ন রসিকের।

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে জবাব দিলাম যে, আমিও মানি না।

রসিক খুব খুশি। নিজেই উঠে গিয়ে অর্ডার দিল ছ' প্লেট মাংস আর রুটি।

কাঁদবে—? বেশ তো খেয়ে কাঁদো। রসিক দাঁত দিয়ে হাড়ের মাংস ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, না খেয়ে কাঁদবে কেমন করে? জোর পাবে কেমন করে? কান্নারও শক্তি চাই।

রসিকের কথাগুলিই মজার। কিন্তু তার চেয়েও কৌতুকবোধ হচ্ছে ওর মাংস খাবার কায়দা দেখে। মজার সব কথা বলছে। হো হো শব্দে হাসছে। আর খাচ্ছে। হাসতে হাসতে খেলে নাকি তাড়াতাড়ি হজম হয়।

খাওয়া সেরে বাইরে এলাম। রসিক রিক্শাভাড়া করল। আমরা এসে পৌঁছালাম শহরের প্রায় শেষপ্রান্তে। গড়ে ওঠা শহরের কাছে এ অঞ্চলটা যেন অপাংক্তেয়; কিন্তু অনাবশ্যক নয়। এখানেই সেই ব্রাহ্মণের বাস। হঠাৎ মনে হল জীবনের কোন

ক্রিয়াকর্মে যোগ নেই বলে তিনি এসে আস্তানা গড়েছেন এইখানে।

তিনি বাইরে বেরুচ্ছিলেন। আমরা যেতেই যাওয়া বন্ধ রেখে আপ্যায়ন করে বসালেন আমাদের। দোকানী যেমন আপ্যায়ন করে খদ্দেরকে। তারপর জানতে চাইলেন কে মারা গেছে। সম্ভবতঃ যে-কোন আগন্তুকের কাছে এটাই তাঁর স্বতঃসিদ্ধ প্রথম প্রশ্ন।

বাবা।

তিনি আমার দিকে তাকালেন। তাঁর কোঠরগত চোখের পলকহীন হিমশীতল দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে মাথা নীচু করলুম।

কি করতেন তিনি ?

বাবা জমিদারী সেরেস্তায় কাজে ইস্তাফা দিয়ে তারপর কি করতেন আমার জানা ছিল না। বাবা কোনদিন বলেননি। আমিও জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু এর কাছে নিজের এই অসঙ্গত অজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে বিব্রত হলাম।

রসিক বোধহয় আমার অস্বস্তি অনুভব করল।

চাকরি করতেন না নিশ্চয়ই—রসিক আমার দিকে তাকাল।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম—না। করতেন না।

তোমার আর কে আছেন ? ব্রাহ্মণ একইভাবে আমার দিকে তাকিয়ে।

কেউ নেই।

মা ?

না।

ভাই বোন ?

না।

সব শূন্য ! চমৎকার !

বৃদ্ধ চুপ করলেন। সংসারের বহু আর বিচিত্র মৃত্যুর সাক্ষী হতে

হতে তার মধ্যে এসে গেছে এক নির্বাক স্থবিরতা। অদ্ভুত নিষ্করুণ তাঁর চাউনি। শ্মশানের পোড়া কাঠের মতো চেহারা।

কত বয়স হয়েছিল? ওর কণ্ঠস্বর এবার যেন কিছুটা স্তিমিত আর ভগ্ন।

বাবার বয়সের কথা আমার জানা ছিল না। কিন্তু 'জানিনা' শব্দটি যত ছোটই হোক—এখানে সেটা যে বেমানান এবং লজ্জাকর সেটা আন্দাজ করতে পারছিলাম আমি। তাই মনে মনে বয়সের কথা হিসেব করলাম। পঞ্চাশ কিংবা সত্তর দুই-ই হতে পারে। কিন্তু এমন বেয়াড়া হিসেব বলা যায় কি করে!

বৃদ্ধ এতক্ষণ যেন আত্মমগ্ন ছিলেন। পুনশ্চ বললেন, বয়েস হয়েছিল নিশ্চয়ই—?

তৎক্ষণাৎ তাঁর কথার সমর্থনে মাথা নাড়লাম। আবার তাঁর একটা ছোট নিঃশ্বাস পড়ল।—বললেন—আমারও ডাক এলো বলে।

ভারী পরিবেশ সৃষ্টি হল। যেন এই মূহূর্তে আমরা সকলেই মৃত্যুর মুখোমুখি। আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় ক্লান্ত বিমর্ষ স্তব্ধ আমরা।

কিন্তু বেশিক্ষন স্থায়ী হল না। বৃদ্ধ স্বভাববশে সামলে নিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক করলেন। ঘরে নিয়ে একটা পুঁথি এনে সুরু করলেন বক্তৃতা। মৃত্যু—পরলোক—আত্মা—পিতৃপুরুষ এমনি নানা ভারী আর গুরু-গম্ভীর শব্দে তাঁর বক্তব্য আমার কাছে রীতিমতো দুর্বোধ্য বলে মনে হতে থাকল। কিন্তু আমি বিচলিত না হয়ে গম্ভীর মুখে বসে রইলাম। যেন আমি একজন অভিজ্ঞ শ্রোতা।

বক্তৃতা শেষ করে এক গেলাস জল খেলেন। গলা শুকিয়ে যাবারই কথা। তারপর একটা ফর্দ এগিয়ে দিলেন। শ্রাদ্ধাদির উপকরণের যথাযথ হিসেব। ফর্দখানা পুরানো হয়ে গেছে। মনে হল অনেকদিন আগেকার করা। একবার করে রেখেছেন। যারা

আসে তারা ঢুকে নিয়ে যায়। ওঁকে বার বার নতুন ফর্দ করার ঝামেলা সইতে হয় না।

চিন্তা করবেন না। অল্প খরচে করেই দেব। চুল কামাতে না চাইলেও চলবে। কিন্তু পয়সা ধরে দেবেন। পিতৃ-তর্পণ আজকাল টাকার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। তাই আমাদের ফর্দও সরল হয়ে গেছে। একটু থেমে বললেন কিছু অগ্রিম—

আমার পকেটে তখন মাত্র দু'টো টাকা। ইতস্তত করতে দেখে রসিক পাঁচটা টাকা বের করে বৃদ্ধের হাতে দিল। তিনি খুব খুশি হলেন। আমরা আর অপেক্ষা না করে বেরিয়ে এলাম।

রাস্তায় তখন ভিড় কম। রসিক বাজারের দিকে চলে গেল। আমার কাজের তাগাদা নেই। খিদেও বোধ হচ্ছে না। মনের মধ্যে এত সময় যে গুমোট ভাব ছিল সেটা কেটে গেছে। গোলমেলে অঙ্ক অনেক চেষ্টার পর মিলে গেলে যেমন আনন্দ হয় ঠিক তেমনি। চিঠি পড়া অবধি বাবার মৃত্যু-সংবাদ আমাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছিল। মৃত্যুর পরবর্তী দায়িত্ব পালনের অস্বস্তি। তবু ভালো যে, আমার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। প্রচলিত নিয়মের সঙ্গে খাপ খাইয়ে মিলিয়ে বিধি-বিধান পালনের হাত থেকে অন্তত রেহাই পেয়েছি। স্বস্তিবোধ করছি আমার দায়িত্ব বুড়ো হাড়গিলে ব্রাহ্মণের কাঁধে চাপিয়ে। আমাকে ভাবতে হবে না। আমার দায় শুধু মন্ত্রোচ্চারণ করা। যার একবর্ণ অর্থও বোধগম্য হবে না আমার।

হঠাৎ হাসি পেল। আত্মার সদ্গতির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ....ইত্যাদি কয়েকটি কথা বুড়োটা বক্তৃতার মতো মুখস্ত বলেছিল আমাকে। আত্মা? বাবার আত্মা কেমন? সেও কি বাবার মতো স্বভাব পাবে? অমনি ভাবলেশহীন? অমনি নিরুত্তাপ?

বাদামের খোসা ছাড়াবার মতো বিষয়টিকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে অন্য পথে এসে পড়েছি। যেখানে সেদিন রাতে সেই রিক্‌শাওয়ালা আমায় নিয়ে এসেছিল। এখানে পৌঁছেই সেই রোগা আধময়লা

বেশ্যাটার কথা মনে পড়ল। সেদিন মজুরী দিতে পারিনি। আজ পকেটে টাকা আছে। বাবার শ্রাদ্ধের জন্য পুরোহিতকে দেয় অগ্রিম টাকা আমায় দিতে হয়নি।

অনেক দরজায় ঘা দিয়ে অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ গায়ে নিয়ে অবশেষে সেই দরজায় এসে দাঁড়ালাম।

দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। টোকা দিলাম। কোন সাড়া এল না। এবার জোরে ধাক্কা দিলাম। ওর নাম জানি না; তাই নাম ধরে ডাকতে পারছিলাম না আমি।

বিরক্তি নিয়ে বক্‌বক্‌ করতে করতে সেই মেয়েটিই দরজা খুলে আমার সামনে দাঁড়াল। কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। টলছে; পড়ে পড়ে যাচ্ছে। লজ্জা নিবারণের মতো স্বল্প পোশাকেরও যেন ওর এখন চাহিদা নেই। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি।

তুমি এসেছ?....আজ কেন?....কাল এলে পারতে?....হঠাৎ সমস্ত দেহটা অবলম্বনহীন করে আমার বুকে লুটিয়ে পড়ল। মুখ ঘষতে থাকল আমার বুকে, হাতে। দেশী মদের ঝাঁজাল গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিক।

ঘরে চল্‌ মিন্‌সে—হঠাৎ প্রায় চিৎকার করে উঠল সে। তারপর কেঁদে ফেলল।—আমায় মেরে ফেল তোমরা।....ততক্ষণে ও আমার কোমর জড়িয়ে ধরেছে শক্ত করে।

আমার খুব স্ফুর্তি বোধ হল। আলগোছে ওর প্রায় নগ্ন দেহটা জাপটে ধরে ভিতরে ঢুকতেই বাধা পেলাম। আদিম মানুষের চেহারা নিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল একটি লোক। আবছা অন্ধকারেও তার চোখ-মুখের হিংস্রতা আমার নজর এড়াল না।

ছেড়ে দে—। হুঙ্কার দিয়ে হাত চেপে ধরল আমার। এবং কোন কিছু ভাববার অবসর না দিয়েই ঘুষি বসিয়ে দিল আমার কানের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে ওলট-পালট হয়ে গেল পৃথিবী। তারপর অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকারে সব ঢেকে গেল।

কতক্ষণ....। অনেকক্ষণ....। আধঘণ্টা... একঘণ্টা। হয়তো পাঁচঘণ্টাও হতে পারে। ঘুষি খেয়েই রাস্তার ওপর পড়ে গিয়েছিলাম। যখন চোখ মেললাম—তখন এ পাড়ার আলো নিভে গেছে।

অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ালাম। সর্বাঙ্গে ব্যথা। চোখজোড়া ভারি। মুখের একপাশ ফুলে উঠেছে। কাঁধের কাছে চাপ চাপ শুক্‌নো রক্ত। আস্তে আস্তে হেঁটে বাসায় ফিরে স্নান করলাম। ঘুম আসছে না। বসে রইলাম ইজিচেয়ারে। আকাশে ভোরের আলো ফুটতেই চোখে ঘুম নেমে এল।

দিন দুয়েক বিছানায় কাটিয়ে অফিসে গেলাম।

সেদিন অফিস ছুটির পর গীতা তার চেয়ারে বসে রইল। আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। গীতার ক্ষেত্রে এটা ব্যতিক্রম। কাজের চাপ যতই থাক গীতা ছুটির পর অফিসে থাকে না। গীতার চোখে মুখে আজ একরাশ দুশ্চিন্তা।

এখন চলুন....একসময় গীতা এসে আমার সামনে দাঁড়াল। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

বাইরে বেরিয়ে এলাম। এতক্ষণ ভাপ্‌সা গরমের পর ঝিরঝিরে হাওয়া খুব আরাম দিল।

সারাটা পথ পাশাপাশি নিঃশব্দে হেঁটে এল গীতা। ওর বাসা পর্যন্ত একটি কথাও ও বলেনি। আমারও কথা বলতে ইচ্ছে করেনি। বরং আলো-আঁধারির পথে যে কোন ধরনের কথাই আমার কাছে অনভিপ্রেত।

ঘরে ঢুকে আমাকে বসতে দিয়েই হঠাৎ যেন কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। আমার ডান হাতখানা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে বলল যে, তাকে আমার সাহায্য করতে হবে। নইলে সে আত্মঘাতী হবেই। প্রতারক আজ তাকে নামিয়ে দিয়েছে সর্বনাশের শেষ সীমানায়।

আমার সাহায্য ছাড়া তার দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।—সে বাঁচবে না।

ছোট ছোট কথা; কখনো জোরে কখনো আস্তে; কখনো প্রলম্বিত করে গীতা আমাকে যেন উপঢৌকন দিল। আমিও ওর কথার সঙ্গে সঙ্গে কখনো গম্ভীর হলাম। কখনো হাসলাম। কখনো বা মুখ গোমড়া করে গুরুত্ব দিতে চাইলাম বিষয়টির। বস্তুতঃ কানামাছি খেললাম গীতাকে নিয়ে।

যখন উঠে এলাম—তখন অনেক রাত। গীতা আমাকে বিষয়টি গোপন রাখতে অনুরোধ করল। এ অনুরোধ না করলেও চলত তার। যদিও জীবনে এই প্রথম একটি মেয়ে নিভৃতে ডেকে এনে আমার সাহায্যপ্রার্থী হল তবু এর মধ্যে কোন উত্তেজনার কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। আমার কাছে এর গুরুত্ব অতি সামান্য। জলে-ডোবা মানুষ কুটো জড়িয়ে ধরে; সে কেবল বাঁচার তাগিদে। কুটোর বিশিষ্টতায় নয়।

কয়েকদিন কেটে গেল। গীতার কথা হঠাৎ কখনো মনে পড়ে। কিন্তু সেটা মনে স্থায়ী হয় না। নিজের কেন্দ্রবিহীন জীবন থেমে আছে কি চলমান তাও বোধগম্য হয় না আমার। রসিক আসে। বসে। গল্প করে। আমি নিরুত্তাপ শ্রোতা হয়ে থাকি।

সেদিন রসিক পরামর্শ দিল গ্রামের জমি-জায়গা বাড়ি-ঘর বিক্রি করে সেই টাকায় শহরে গড়ে তুলতে একটা স্থায়ী আবাস। অভয় দিয়ে বলল যে, সে নিজের তদারকে ঘর তৈরি করে দেবে। এজন্য বাড়তি মজুরির প্রশ্ন উঠবে না।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে কোনপ্রকার উৎসাহবোধ হল না আমার। দেশের বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে কোনদিন খোঁজ নিইনি। যে নিরাপত্তাবোধের মধ্যে এ-ধরনের উৎসাহ সজাগ থাকে—সেটা বোধ করিনি কোনদিন। তাই রসিকের কথায় নীরব রইলাম।

বৌকে কবে আনছ?—হঠাৎ রসিক প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল।—

তাড়াতাড়ি নিয়ে এস। বিয়ের পর বেশিদিন বৌকে দূরে রাখতে নেই।

আমার বিয়ে হয়নি।

এ্যা!--আমার কথা শুনেই এমনভাবে সে চমকে উঠল—যে মনে হল—সে একটা অচেনা জীব দেখছে। হতবুদ্ধির মতো আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার চোখের দৃষ্টিও পলকহীন।

আস্তে আস্তে সমস্ত ঘটনাটি তাকে তখন বললাম।

প্রচণ্ড বেগে হেসে উঠল রসিক। একটানা হো হো শব্দে হাসি। হাতের নিভন্ত সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে আর একটা ধরাল। আবার হাসি। থেমে থেমে, বহুক্ষণ।

এবার একজন গল্প-লিখিয়ের কাছে যাও। যারা কিস্যু জানে না। অথচ বানিয়ে বানিয়ে মোটা কেতাব লেখে। দেখবে তোমাকে নিয়ে কেমন মজাদার উপন্যাস হয়ে যাবে।

রসিক এক একটি কথা বলে আর হাসে। যেন এর চেয়ে বড় মজার ঘটনা আর ঘটেনি। অথচ এই ঘটনায় বাবা মনোকষ্ট পেয়েছিলেন। গ্রামের বয়স্ক লোকেরা নিন্দে করেছিল। অপ্রসন্ন হয়েছিলেন রাঙাপিসী। একটি ঘটনার বিচিত্র পরিণতি।

চূড়ান্ত হাসি শেষ করে রসিক হাঁপাতে থাকল।

মেয়েটির ভাগ্য ভালো যে তোমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়নি। হলে আমরাও তাঁর কাছে মুখ উঁচু করতে পারতুম না। নাও এখন অনেক রাত হল। শুয়ে পড়।—রসিক নেমে গেল।

অনেক রাত অবধি আকাশের দিকে অর্থশূন্য দৃষ্টি মেলে আমি বসে রইলাম।

* * *

আজ অফিস নেই।

অনেক বেলা অবধি বিছানায় গড়ালাম। দোকান থেকে দু'বার চা দিয়ে গেছে। সিগারেট পুড়িয়েছি গোটা কয়েক। শেষে এক-সময় বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লাম আমি।

ছুটি, ফলে কাজ নেই। সুতরাং অস্বস্তিরও সীমা নেই আমার। একরাশ সময় যেন আমার মাথার ওপর এসে পড়েছে। এই অনাবশ্যক সময়কে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে আমি কোনদিনই পারিনি। অথচ আমার চারপাশের চলমান জগৎ ছুটির নেশায় চঞ্চল।

খবরের কাগজ পড়লাম। রাস্তায় অর্থহীন পায়চারি করলাম। পার্কের বেঞ্চে কাটালাম কিছুক্ষণ। তারপর ঘরে এসে দরজা এঁটে শুয়ে পড়লাম আবার।

ভালো লাগল না। উঠে পড়লাম। ঘরদোর বড্ড ময়লা হয়ে গেছে। সাফ করলে কেমন হয়? কিংবা খাটখানা উত্তর থেকে দক্ষিণে সরিয়ে নিলে? দোরের কাছে। টবের গোলাপ গাছটি জলের অভাবে মরে গেছে। একটি ফুলও কোনদিন ফোটেনি। এবার ওটাকে সরিয়ে দিতে হবে। অথবা—

অথবা নিয়ে যখন আমি নিজের সঙ্গে কলহ করছি ঠিক তখন সোমা ঘরে ঢুকল।

বিস্মিত হলাম। সোমাকে এ সময় আশা করিনি আদৌ। সেদিন কান্না চাপতে চাপতে সে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল আর কখনো এ-মুখো হয়নি। তাই ওর এই আকস্মিক আগমনে কেমন যেন ভয় পেলাম। হঠাৎ কথা বলতে পারলাম না। নির্বোধের মতো হাঁ করে চেয়ে রইলাম ওর দিকে।

সোমা ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। কিঞ্চিত কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। হাসল। কিন্তু কথা বলল না।

কিছু সময়। বোধহয় আমার কাছ থেকে স্ফুট বা অস্ফুট উচ্চারণের সম্ভাষণ আশা করেছিল সে। তারপর এগিয়ে এল ঘরের মধ্যে। এক পলক দেখে নিল চারদিক। টেবিল চেয়ার খাট বিছানা। আর দেরি করল না। মুহূর্তে কতব্য স্থির করে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হাত লাগাল কাজে। ঠিক আগের মতো। বন্ধ

জানালাগুলো খুলে দিল। আলনা সাজাল। ঘর ঝাঁট্ দিল। গুছিয়ে রাখল রান্নাঘরের সরঞ্জাম। কিছু সময়ের মধ্যেই আমার ঘরের চেহারার পরিবর্তন ঘটাল সে। আমার প্রতি কৌতূহল না রেখেই।

বাবা কবে মারা গেলেন? জানালার পর্দা লাগাতে লাগাতে হঠাৎ প্রশ্ন করল সোমা। খুব মৃদু স্বরে।

আমি একটু বিস্মিত হলাম! বাবার মৃত্যু-সংবাদ ওর জানার কথা নয়। কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করলাম না। সোমাকে তখন রাঙা-পিসীর চিঠিখানার কথা বললাম আমি।

খুব সংক্ষেপে বললাম। শব্দগুলি যথাসম্ভব বাছাই করা। প্রিয়জনের মৃত্যু-সংবাদ পেশের উপযুক্ত। আমার উত্তাপহীন মুখে কোন ফাটল রেখায়িত হল কিনা সেটা অবশ্য অজ্ঞাতই রইল।

নিঃশব্দে আমার স্বগতোচ্চারিতের মতো কথাগুলো শুনল সোমা। ওর মুখখানা বিষণ্ণ দেখাল। ওর চোখের কোণে জল আছে কিনা এই পড়ন্ত আলোয় বোঝা গেল না।

দু'জনে নিঃশব্দ রইলাম অনেকক্ষণ।

এখন কি করবে?—খুব আস্তে সোমা একটি কঠিন প্রশ্ন আমার সামনে ঠেলে দিল।

চকিতে একবার ওর দিকে তাকিয়ে প্রায় অর্থশূন্য দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলাম অন্য দিকে। অনেকটা খোঁটায় বাঁধা গরুর মতো। এগিয়ে গেলাম জানালার কাছে। বাইরের রাস্তায় তখন লোকজনের ভিড় বাড়ছে।

কাঁদতে হয় কাঁদো!—কিন্তু তুমি তাঁর একমাত্র সন্তান। কর্তব্যে ভুল কোর না। সোমা এবার দম নিল। আবার বলল, উদাসীন অন্যের প্রতি হও; তোমার খুশি। কিন্তু দোহাই তোমার—নিজের প্রতি উদাসীন হয়োনা।

অত্যন্ত গাম্ভীর্যে এই বিষণ্ণ কথাগুলো সোমা উচ্চারণ করলেও

আমার কাছে বস্তুতঃ কার্তিকের হিমের মতো বিরক্তিকর বোধ হল। বাবার মৃত্যু-জনিত যে শূন্যতা নিয়ে এদের মাতামাতি, আসলে আমার কাছে সেটা শূন্যতাই নয়। কিন্তু একথা আমি কাউকে বোঝাতে পারি না! সোমাকেও নয়। যদিচ এদের এই সাময়িক ভাবান্তর ভনিতা কিংবা প্রহসন নয়;—স্বাভাবিক। কিন্তু আমার অনুভূতি সেই স্বাভাবিক প্রবণতায় সাড়া দিচ্ছে না কিছুতেই।

বেশ কিছু সময় কেটে গেল। সোমার কথার প্রতি-উত্তর দেওয়া হয়নি। আমার মনে হল, আমি ছাড়া, অন্য যে কেউই এখন আস্তে-জোরে, স্বর উঠিয়ে-নামিয়ে নানান ভঙ্গীমায় ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ অনেক কথাই বলত। সেইসব কথার মধ্যে এক একটি বৃত্ত রচিত হত যার আধার ভালোবাসা মমতা শ্রদ্ধা প্রীতি—ইত্যাদি।

কিন্তু আমি নির্বাক রইলাম। ঘরে অন্ধকার নেমে এসেছে। সোমা টেবিলের ওপর মাথা রেখে সেই অন্ধকারে ডুব দিয়েছে যেন। আমাদের কারোরই আলোর কথা মনে নেই।

সোমা কি কাঁদছে? এই অন্ধকারে সেটা অনুভব করতে না পেরে পায়ে পায়ে ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। একখানা হাত ধরলাম আমি; ওর শরীরটা বোধহয় একবার নড়ে উঠল। আমি একটু চাপ দিলাম। ও এবার মুখ উঁচু করল। তাকাল সোজাসুজি। অন্ধকারে সে-দৃষ্টির ভাষা পড়তে পারলাম না। কিন্তু অনুভব করলাম সোমার চোখে রয়েছে বিশাল এক আকুতি। যার অর্থ আমি আলগোছে পিঠে হাত রেখে অর্থাৎ চাপ দিতেই ও উঠে দাঁড়াল। আমার মুখোমুখি। ওর চুলের তীব্র গন্ধ অন্ধকারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সারা শরীর কাঁপছে যেন। আমি ওকে আরো কাছে টেনে নিলাম। ও বাধা দিল না। বরং ঝুঁকে পড়ল একটু। মুখখানা ছু'হাতে তুলে ধরলাম। এবার দেখলাম ওর চোখে জল টল টল করছে। কোনও একটা শব্দ উচ্চারণের চেষ্টায় ঠোঁট জোড়া কাঁপছে। ক্রমশ সোমা যেন ভেঙে পড়ছে।

গাছ না পেয়ে লতা যেমন নেতিয়ে পড়ে যায়। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে জাপটে ধরে ফেললাম। ওর মুখখানা আমার বুকের সঙ্গে মিশে গেছে। তীব্র একটা যন্ত্রণার স্রোত আমার সর্বাঙ্গে বয়ে যেতে থাকল। যা সহ্য করা কঠিন। মনে হল আমার শরীরের সমস্ত স্নায়ু জুড়ে দাবদাহের সৃষ্টি হয়েছে। পাগলের মতো সোমাকে বুকের মধ্যে পিষে ফেলতে লাগলাম। সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রাণপণে। প্রবল স্রোতের টানে ধস যেমন ভেঙে পড়ে, সোমারও তাই ঘটল। অন্ধকারের মধ্যে আমরা দু'জনে আদিম আনন্দে চেতনা হারালাম।

পরদিন সকালে সোমা উপস্থিত।

ঠিক আগের মতো। এসে আমারে ঘুম ভাঙাল। চা বানাল। খাবার তৈরি করল। ঘর গুছিয়ে ঠিকঠাক করল। আজ ওকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছে। চুলে ফুল্ গোজা। চোখে কাজল। পরনে হালকা নীল শাড়ি। রান্নাঘরে ঢুকে গুণ গুণ স্বরে গান গাইছে। মাঝে মাঝে হালকা রসিকতা। পশ্চিমে মুখ করা জানালায় পর্দা লাগাল। টেবিল চেয়ার সরিয়ে, খাটের জায়গা পালটে, নতুন শ্রী ফোটাল ঘরখানার। সাধারণত কাজ করতে করতে সোমা কথা বলে না। আজ তার স্বভাবের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম। খুশির অভিব্যক্তি বরাবরই ওর পরিমিত। আজ যেন ওর দেহে মনে জোয়ার এসেছে।

কবে শ্রাদ্ধ?—খাবার পরিবেশন করতে করতে সোমা প্রশ্ন করল।

কাল।

কাল!—বিস্ময়ে আমার দিকে তাকাল সোমা। সব তৈরি তো?

সোমাকে আমি সেই হাড়গিলে চেহারার ব্রাহ্মণের কথা বললাম। সোমা যেন কিছুটা আস্বস্ত হল। জানতে চাইল কেনা-কাটা

কিছু বাকি আছে কিনা। দরকার হলে আজই সেরে রাখা যাবে। বলল যে, ব্রাহ্মণের ওপর সব দায় চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। এ সব কাজে নিজের দায়িত্বই সব চেয়ে জরুরী।

আস্তে আস্তে সোমা আরো অনেক কথাই বলল। কিছু কানে গেল; কিছু গেল না। তবে একটা কথা স্পষ্ট হল যে সাংসারিক ব্যাপারে সোমা নিপুণা।

আমি জবাব না দিয়ে সোমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনার ভনিতা করলাম। আসলে কিন্তু এসব গুরুতর প্রসঙ্গ ভালো লাগছিল না। শ্রাদ্ধের মতো একটা বেয়াড়া ব্যাপারের খুঁটিনাটি বিধিবিধান নিয়ে মাথা ঘামানো—আমার কাছে সারাদিন একটানা পরিশ্রমের চাইতেও দুরূহ। এ ধরনের কাজে কতটা দায়িত্ব নিজে বহন করা উচিত আর কতটুকু অপরের ওপর নির্ভর করা যেতে পারে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আমার নেই।

এই প্রথম মনে হল সোমা আমাকে গভীরভাবে ভালোবাসে। তাই আমার নিস্পৃহতায় ও বিচলিত। ওর ধারণা সামাজিক দায়-দায়িত্ব বহনে আমি অক্ষম। তাই আমার সমস্ত কাজেই ওর এই ধরনের খবরদারী।

কয়েকদিন আগে হলে আমার এই নিরুত্তাপ উদাসীনতায় ও বিরক্তি প্রকাশ করত। আজ আর তেমন কিছু করল না। বরং মনে হল ওর সব কথা নিঃশব্দে মেনে নিচ্ছি বলে ও যেন খুশি।

সোমার সঙ্গে কথা হয়ে রইল বিকেলে অফিস থেকে বাসায় না ফিরে আমি সোজা ওদের বাড়ি চলে যাব। সোমা আমার জন্য অপেক্ষা করবে। তারপর আমরা দু'জন সেই ব্রাহ্মণের বাড়ি যাব। ফর্দ মিলিয়ে কিছু বাকি থাকলে কিনে ফেলব আজই।

দেখো, আবার যেন কাজের নেশায় ভুলে যেওনা। মৃদু হেসে সোমা ঠাট্টা করল আমায়। অনেকদিন পরে সোমার স্নিগ্ধ পরিহাস আমার ভালো লাগল।

তোমার বাবার শ্রাদ্ধের মন্ত্র আমায় পড়তে দেবে ?—আচমকা গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করল সোমা।

অর্থ উদ্ধার করতে ওর দিকে তাকালাম। কৌতুক নয়; ওর চোখে সহজ ও আন্তরিক দৃষ্টি।

না। সে অধিকার আমার নেই।—আমাকে জবাব দেবার অবসর না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিজেই জবাব তৈরি করল সোমা।—আমি বুঝি! সোমার ঠোঁটে বিষণ্ণ এক টুকরো হাসি।—কিছু মনে কোর না। কথাটা এমনিই বললাম।

চল; দেরি হয়ে যাচ্ছে তোমার।—সোমা উঠে দাঁড়াল। তোমাকে অফিসের পথে খানিকটা পৌঁছে দিয়ে যাই। সোমা আমার ব্যাগটা তুলে নিল।

অফিসে পোঁছাতে আজ দেরি হয়ে গেছে। যে যার টেবিলে কাজে ব্যস্ত। তাড়াতাড়ি আমি আমার চেয়ারে গিয়ে বসলাম। অনেক কাজ জমে গেছে। নতুন মাল এসেছে। কিছু বাইরে যাবে। আজ আর নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পাব না।

দারোয়ান একখানা চিঠি দিল আমায়।

খুলে দেখি গীতার লেখা। দু'টো লাইন। "রবীনবাবু, ভীষণ বিপদে পড়েছি। এখুনি চলে আসুন। গীতা।"

অর্থ বুঝলুম না! কি বিপদ কেন বিপদ কিছুরই ইঙ্গিত নেই। অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে ভাবে লেখা গীতার চিঠি হাতে নিয়ে কিছু সময় নাড়াচাড়া করলাম। মেয়েদের চিঠি বোধহয় এমনিই হয়।

সোমা প্রথম দিকে আমাকে এমনি দুর্বোধ্য আর অস্পষ্ট চিঠি লিখত। ওর মনের মতো জবাব দিতে পারতুম না বলে শেষ-পর্যন্ত আমাকে চিঠি লেখা ছেড়ে দিয়েছিল সোমা। এখন যা বলে—মুখে।

হাতের কাজ ফেলে রেখে বাইরে এলাম। আকাশ কালো-মেঘে ছেয়ে গেছে।

গীতা আমার জন্য বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখে যেন আস্বস্ত হল। বাইরের ঘরে না বসিয়ে নিয়ে গেল ভিতরের ঘরে। গীতার চেহারায় অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। দু'দিন আগেকার সে চেহারা আর নেই। চোখের কোণে কালি। উস্‌কো খুস্‌কো চুল। ক্লান্ত মুখ। যেন প্রচণ্ড এক ঝড় বয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে। সে আর পারছে না। এই বিবর্ণ বিষণ্ণ আর পরিশ্রান্ত মেয়েটিই যে অফিসের চঞ্চলা চপলা এবং সদা-হাস্যমুখী গীতা—তা আর বোঝার উপায় নেই।

কিভাবে কথা আরম্ভ করি? কুশল প্রশ্ন করে? অফিসের কথা বলে? অথবা ওর চিঠির প্রসঙ্গ তুলে? হঠাৎ ঠিক করতে না পেয়ে চুপচাপ রইলাম। গীতাও যেন কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছে না। ও শুধু শাড়ির আঁচলে আঙুল জড়াচ্ছে। ওর মনের মধ্যে যে গুরুতর একটা আবর্ত রচনা হচ্ছে—এটা স্পষ্ট।

আমার জন্যে আপনি কি করতে পারেন রবীনবাবু? অনেক সময় দম নিয়ে হঠাৎ এক জটিল প্রশ্ন করল গীতা। সোজা স্পষ্ট আর নির্ভীক তার দৃষ্টি। কণ্ঠস্বর শান্ত ও গম্ভীর। মনে হল আমার জবাবের ওপর তার ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে।

সোমা হলে এ ধরনের প্রশ্নে কোন জবাব না দিলেও চলত। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি চলকে উঠলেই হত। কিংবা চোখের মণিতে অর্থশূন্য হাসি। কিন্তু গীতা সোমা নয়। তাই একবার দম নিয়ে বললাম—অনেক।

জবাব পেয়েই গীতার চোখজোড়া যেন দপ করে জ্বলে উঠল। ক্ষণপূর্বের জড়তাও কেটে গেল। তাড়াতাড়ি ড্রয়ার খুলে বের করল একখানা চিঠি। আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল—পড়ে দেখুন। বিনু লিখেছে।

অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। বিনুর চিঠি গীতার সামনে পড়া সঙ্গত হবে কিনা বুঝে উঠতে পারলাম না। কিন্তু গীতা আমার এই

দ্বিধা খেয়াল না করেই বলল—বিন্নু সম্পর্ক রাখতে চায় না। রবীন-বাবু! ও আমার সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে গেছে। আর আমার কিছু নেই।

ছু'হাতে মুখ ঢেকে গীতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। আমার সামনে তার এখন আর কোন সংকোচ, কোন জড়তা নেই। জীবনের এত বড় পরাজয়ের গ্লানিময় স্বীকৃতি দিতে সে দ্বিধাযুক্ত।

আমি চিঠিখানা পড়লাম। খুব সংক্ষিপ্তভাবে লেখা। সংসারের চাপ সামলে সে আর নতুন জীবনে জড়িয়ে পড়তে সক্ষম নয়। গীতা যেন তার জন্য অপেক্ষা না করে। সে এখন সত্যিই নিরুপায়।

বারবার চিঠিখানা পড়লাম। স্বল্প কয়েকটি লাইনের কোথাও 'গীতার সর্বস্ব লুঠ' অভিযোগের আভাস পেলাম না। বরং বিন্নুর চিঠি আমার কাছে ভালোই লাগল। নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে কেমন সুন্দর পরিমিতভাবে সে লিখেছে।

কিন্তু কেন সে এ কথা আগে ভেবে দেখেনি? গীতা প্রায় রোষে গর্জে উঠল। কেন সে আমাকে এতদিন ধরে প্রতারণা করল? আপনি বলতে পারেন রবীনবাবু?

আমি গীতার দিকে তাকিয়ে ভয় পেলাম। মনে পড়ল সোমার কথা। একদিন সেও এমনিভাবে আমার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনে রোষে ক্ষোভে গর্জে উঠেছিল।

আমি ছাড়ব না।—কিছুতেই না। আমার জবাবের প্রত্যাশা না করেই গীতা সহসা আমার হাত জড়িয়ে ধরল।—আপনি—আপনি আমাকে সাহায্য করুন রবীনবাবু।

আমি নির্বাক রইলাম। গীতা যেন ক্ষেপে গেছে। কখনও চোখের কোণে জল চিক্‌চিক্ করে উঠছে। কখনও দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরছে। প্রচণ্ড আবেগে মাঝে মাঝে ওর সারা শরীর যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। এ যেন অন্য কোন গীতা। আমার অপরিচিতা। প্রতিশোধ নেবার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা ওর। অমন সুন্দর মুখখানা কী কুৎসিত মনে হচ্ছে এখন।

ঘণ্টা দুয়েক বসে পরামর্শ চলল আমাদের। অবশ্য বক্তা গীতা। আমি শ্রোতামাত্র। ও নিজেই বলছে। আবার তার পরিবর্তন করছে। গীতা বলল যে বিনু দু'একদিনের মধ্যেই এই শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে। একবার চলে গেলে আর তার নাগাল পাওয়া যাবে না। যা করবার আজই করতে হবে।

শেষ অবধি ঠিক হল—বিনুর সঙ্গে আমি দেখা করব। গীতা আমার সঙ্গে থাকবে। আমি তাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করব—গীতার ভবিষ্যৎ—স্পষ্ট জবাব চাইব। প্রয়োজন হলে কৈফিয়ৎ চাইব।—চূড়ান্ত জবাব গীতার আজ চাই।

তখন প্রায় বিকেল। আকাশে জমাট মেঘ। বৃষ্টি নামেনি। ভাপসা গরম। গীতা আমাকে আর অফিসে যেতে দিল না। বিনুর লেখা আরও কয়েকটি চিঠি পড়লাম। ওদের দু'জনকার মন দেওয়া-নেওয়ার প্রামাণ্য দলিল। তাতে কত শপথ! কত ভালোবাসার প্রতিজ্ঞা! কত স্বপ্নময় দিনরাতের রেখাচিত্র!

একটা নীলরঙের খাম খুলতেই গীতা আমার কাছ থেকে সরে অন্য ঘরে চলে গেল।

গীতা অন্তঃসত্ত্বা!

ডাক্তারের রিপোর্টখানা হাতে নিয়ে আমি যেন শূন্য হয়ে গেলাম। এই অভাবিত অবস্থার গুরুত্ব সঠিক উপলব্ধি করতে ন পারলেও মনে হল ঘটনা অনেক দূর গড়িয়েছে। কিন্তু এর পরিণতি কি হতে পারে তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।

কিছু পরে গীতা এল। খুব ধীর পায়ে। মাথা নিচু করে। কিছু আগেকার বিদ্রোহিনী সে আর নয়। এখন সে পরাজিতা ও লাঞ্ছিতা সম্রাজ্ঞী। চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে যন্ত্রণাদগ্ধ বিষণ্ণতা। নিজের অপরাধের ভারে পীড়িতা ও শঙ্কিতা সে। আমার কাছে

নারীজীবনের সব চাইতে বড় পরাজয় উন্মোচন করে এখন সে যেন একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে। ও আর কাঁদতে পারছে না। ঝরবার মতো জল বোধহয় আর নেই। মাথা উঁচু করে তাকাতে পারছে না। গুরুভার লজ্জায় ম্রিয়মানা। শুধু অপরিসীম যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

রবীনবাবু! এতবড় ভার আমি কিভাবে বইব বলতে পারেন? খুব আস্তে এবং থেমে থেমে গীতা যেন স্বগতোচ্চারিতের মতো কথা বলল। কণ্ঠস্বর দুর্বল আর রীতিমতো নিস্তেজ। চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। চাপা দীর্ঘশ্বাসে ওর মানানসই বুকখানা বুঝি ভেঙে যায়।

আমার ইচ্ছে হল গীতাকে এখন আমি কিছু একটা বলি। উপদেশ, সান্ত্বনা অথবা সমবেদনা। কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছুই বলা হল না। যে-বোঝা ওদের দুজনের তৈরি তার ভারমোচন আমার মতো তৃতীয় জনের পক্ষে অসম্ভব।

উঠে দাঁড়ালাম। পায়চারি করলাম বারকয়েক। সিগারেট ধরালাম। গীতা মাথা নিচু করে বসে রয়েছে। গীতাকে তখন একটা ভারবাহী পশুর মতো মনে হচ্ছে। সামর্থ্যের চাইতে যার কাঁধে বেশি বোঝা চাপান। সে বইতে পারে না। অথচ তাকে বইতে হবেই। গীতারও হয়েছে তাই। বিনু নয়—এ বোঝা গীতাকেই বইতে হবে। গীতা কাঁদবে। দুর্বল হয়ে পড়বে। হোঁচট খাবে। ছিড়ে যাবে বুকের শিরা উপশিরা। তবু সে রেহাই পাবে না কিছুতেই।

সন্ধ্যা হয়ে এল। বিনুকে এখন বাসায় পাওয়া যাবে। গীতার কথামতো উঠে পড়লাম আমরা।

গীতার বাসা থেকে বিনুর আস্তানা বেশ খানিকটা দূরে। রিক্‌শায় গেলে কয়েক মিনিটে পোঁছানো যায়। গীতা রিক্‌শা না ডেকে হেঁটে চলল। পথে যেতে যেতে বলা শুরু করল তার জীবন-কাহিনী।

ছেলেবেলায় হারিয়েছে মা। একটু বয়স হলে বাবা মারা গেছেন। মানুষ হয়েছে মামাবাড়ি। অনুগ্রহ আর বঞ্চনার জ্বালা মর্মে মর্মে তার।

তবু কিছু সান্ত্বনা পেয়েছিল বিনুকে কেন্দ্র করে। আশা করেছিল সে এবার ঘর বাঁধবে। প্রাণখুলে হাসবে....। কিন্তু আজ হাসির বদলে একরাশ কান্না বুক চেপে ধরেছে তার।

বেশ আস্তে আস্তে হাঁটছিলাম আমরা। পথে তেমন 'ভড় ছিল না। কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। গীতার পরণে লাল রঙের শাড়ি। অতীত স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সে যেন অন্য-মনস্ক। আমার চোখে নেশা লেগে গেল। বার বার গীতাকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমি ওর পাশাপাশিই হাঁটছিলাম। মাঝে মাঝে গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগছিল। গীতার সেদিকে খেয়াল নেই। বিপজ্জনক একটা ধস তীব্রবেগে ওর দিকে ছুটে আসছে যেন। সেটা রোধ করতে না পারলে ওর মৃত্যু অনিবার্য। সেই দুঃসহ ভীতিতে সে আছন্ন বলে আমার চোখের দৃষ্টির অর্থোদ্ধারে সে অপারগ।

একসময় থমকে দাঁড়াল গীতা।

যান। বিনুর বাসা। গীতা হাত ইসারায় কিছুদূরের লালরঙের একটা দোতলা বাড়ি দেখিয়ে দিল।

তুমি? আমি গীতার দিকে তাকালাম।

আমি পার্কে বসছি। আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

আমার দিকে গভীর অর্থবহ দৃষ্টি মেলে তাকাল। আমি সে চাউনি সহ্য করতে না পেরে তাড়াতাড়ি বিনুর বাসার দিকে পা বাড়ালাম।

পুরানো একটা দোতলা বাড়ি। শহরের একেবারে শেষপ্রান্তে। এ দিকটায় আমি আগে দু'একবার এসেছি। দু'টো ঘরের মাঝখান দিয়ে উপরে উঠবার সিঁড়ি। নিচের ঘরের দরজা বন্ধ। আমি সোজা উপরে উঠে গেলাম।

বিন্নু ঘরে নেই। দরজায় তালা ঝুলছে।

এখন কি করি? চুপচাপ কিছুসময় দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে নিচেয় নেমে সিঁড়ির ওপর বসলাম। বিন্নু এসে এই পথেই উঠবে।

একটা সিগারেট ধরালাম। এটাই শেষ সিগারেট। আরাম করে টানতে থাকি। আর মনে মনে বিন্নুর সঙ্গে আমার সম্ভাব্য সংলাপের মহড়া দিই। কিভাবে প্রসঙ্গটি ওঠাব, কতদূর আলোচনার আয়তন টেনে নেব কিংবা কোন বিষয়ে ইতি টানব সে বিষয়ে আমার সুস্পষ্ট কোন ধারণা নেই। গীতা আমায় নির্দিষ্ট-ভাবে কিছু বলে দেয়নি। শুধু একটা বোঝাপড়া করতে হবে এটাই বলে দিয়েছে কিন্তু সীমা টেনে দেয়নি সে। তাই হঠাৎ আমি যেন বিব্রতবোধ করলাম। একবার ইচ্ছে হল গীতার কাছ থেকে জেনে আসি। কিন্তু সেটা মনঃপূত হল না। আমার প্রতি তাহলে ওর আস্থা কমে যাবে।

শেষপর্যন্ত ঠিক করলাম সামনাসামনি সেই মুহূর্তে যা মনে আসে তাই বলব।

অনেক সময় কেটে গেল। আধঘণ্টা; একঘণ্টাও হতে পারে। এই ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসে থেকে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। ধড়মড়িয়ে উঠে বসি। একটা কুকুর আমার পায়ের কাছে। বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি; আর দম্‌কা হাওয়া। সিঁড়ির আলো জ্বেলে দিয়েছে কেউ।

একটা সিগারেট টানতে পারলে ভাল হত। শীত করছে। বিছানা পেলে শুয়ে পড়তাম। চোখের পর্দা যেন টেনে রাখতে পারছি না। এক একবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঢলে পড়ি; দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে সোজা হয়ে বসি আবার। একদিন রাতে এক আধমরা রোগীর পাহারা দিয়েছিলাম এমনিভাবে।

কেন বসে আছি ?

আচম্‌কা প্রশ্নটি মনে এল। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। 'কেন' শব্দর মুখোমুখি হতে আমার নিদারুণ ভয়। বহু 'কেন' আমার সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। আর বহুবারই পিছন ফিরে আমি পালিয়েছি। একটা 'কেন'র জবাব দিতেই পিছন পিছন অসংখ্য 'কেন' ভিড় করে। সেটা আরো ভরাবহ।

উঠে দাঁড়ালাম। 'কেন'র হাত থেকে মুক্তি পেতে পায়চারি করলাম কয়েকবার। একটি খাণ্ডাল মার্কা মেয়েলোক উঁকি দিয়ে আমায় দেখল। বোধহয় সন্দেহ করছে আমায়। তুমুল ঝগড়া উপরে। একরাশ জল গড়িয়ে পড়ল সিঁড়ি বেয়ে। কুকুরটি দৌড়ে পালাল। জলের ছাট লেগে আমার কাপড় ভিজে গেছে।

এতক্ষণে দেওয়ালের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছি। হৃৎপিণ্ড কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন বন্ধ হয়ে গেছে। ভয় হচ্ছে আমার ওপর আবার হামলা না হয়।

এমন সময় গীতা এল।

তার পরনের জামা-কাপড় ভিজে একশা। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল—খবর কি!

কিছুই না —আমি বললাম।

ওপরে গিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ।

দেখা হয়নি ?

না।

কেন ? —ঘরে নেই ?

না।

গীতা আমার জবাবে থমকে গেল। ভ্রূ দু'টো কুঁচকে গেছে। নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা। মাথার চুল বেয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে।

আচ্ছা—আপনি অপেক্ষা করুন রবীনবাবু। আমি একবার দেখছি। —গীতা কথা শেষ করেই মুহূর্তকাল অপেক্ষা করল না। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে গেল।

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। গীতার সঙ্গে বিনুর বোঝাপড়া হচ্ছে হয়তো। একজন চায় পালাতে। আর একজন পালাতে দেবে না। আটকে রাখবে। ঘর বাঁধবে। —আমার কাছে এটা একটা রীতিমতো হাস্যকর ব্যাপার।

আমি কি তাহলে চলে যাব? গীতা ও বিনুর এই অবাস্তব বোঝাপড়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোথায়? বিনুকে কিই বা প্রশ্ন করব আমি? আর প্রশ্ন করলে সে যদি জবাব না দেয়?

অনেকগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে আমার সামনে এসে ভিড় করল। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম বলে বিচলিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। —হঠাৎ রাস্তায় একটা রিক্‌শার ঘন্টি কানে এল। মুহূর্তে ঠিক করলাম গীতাকে রেখে আমি চলে যাব।

আমি দরজা অবধি চলে গিয়েছিলাম। এমন সময় গীতার ডাক কানে এল। থমকে দাঁড়ালাম আমি। ও আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তাকে দেখে চমকে উঠলাম আমি। যেন একটা ক্ষ্যাপা কুকুর। আচম্‌কা সে আমার হাত দু'টো জড়িয়ে ধরল। হাঁউ হাঁউ করে কেঁদে কয়েকটি কথা একসঙ্গে বলল। তার বিকৃত কণ্ঠস্বর থেকে এটুকু আন্দাজ করলাম যে, বিনু শুধু তাকে প্রত্যাখ্যানই করেনি, অপমানও করেছে।

আমি প্রতিশোধ চাই। —আর কিছু নয়; তুমি বিশ্বাস করো রবীন। হঠাৎ আবেগে ঘন হয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল—তুমি পারবে না? বলো রবীন! আমার ওপর অপমানের প্রতিশোধ তুমি নিতে পারবে। কথা বলো—জবাব দাও—

কথা বলতে বলতে আমার বুকের মধ্যে মিশে গেছে গীতা।

ওর উদ্ধত বুকের নরম চাপ লাগছে আমার বুকে। ওর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ও তখন প্রায় উন্মাদ।

আমার দেহের সমস্ত স্নায়ুতে সঞ্চিত রক্তে তখন যেন সমুদ্রের তুফান উঠেছে। দেহের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে দাবদাহের উত্তেজনা। পেশীগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে। গীতা প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মাদ। আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে পরিমাণহীন এক চরম পরিণতিতে। আমিও তখন গীতার মতো অর্ধোন্মাদ।

একটা হিন্দী ছায়াছবি দেখেছিলাম। নায়কের কাছে প্রত্যাখ্যাত অপমানিত নায়িকা পাগলের মতো সহ-নায়কের কাছে প্রতিশোধ চাইছে। সেদিনকার সেই বিরক্তিকর দৃশ্য আজ লোভনীয় বলে মনে হচ্ছে।

দৃশ্যটি মনে পড়তেই নেশাগ্রস্ত করল আমাকে। আমি সেই সহ-নায়কের মতো গীতাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। পাগলের মতো চুমু খেলাম তাকে। একটার পর একটা। নোনাজলের স্বাদ পেলাম জিভে।

গীতা ততক্ষণে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়েছে। দেওয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে।

আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙেই নেমে এলাম আবার। সিঁড়ি ভেঙে ওঠার ভঙ্গীমা আমার নায়কোচিত হয়নি। এবার সেই ছায়াছবির সহ-নায়কের মতো উঠব। আস্তে আস্তে; চারিদিক দেখে, প্রতি পদক্ষেপে ছন্দ, যতি ও তাল মিলিয়ে।

থমকে দাঁড়ালাম কয়েকটা সিঁড়ি উঠেই। দেওয়ালের গায়ে কালো রঙের বড় একটা টিকৃটিকি। সাদা দেওয়ালের গায়ে বুক মিশিয়ে স্থির দৃষ্টিতে নিশানা করে আছে। একটা ছোট্ট সরীসৃপের এমন ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা আমাকে নিমেষের জন্য বিমূঢ় করে দিল।

লেজ নড়ে উঠল। হঠাৎ লাফিয়ে পড়ল সামনে—সাদা ছোট্ট একটা পোকাকে লক্ষ্য করে। যেটা এতক্ষণ দেওয়ালে

নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে বসে ছিল। কিন্তু নিশানা ব্যর্থ হল টিকটিকিটির। ধরতে পারল না। উড়ে গিয়ে সাদা পোকাটা অন্যত্র বসল। কালো সরীসৃপের কিন্তু নজর এড়াল না। আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল। আশ্চর্য! এবারেও ব্যর্থ হল নিশানা। দু'দুবার ব্যর্থতার যন্ত্রণায় ও বোধহয় দেওয়াল বেয়ে ছুটে গেল কিছুদূর। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো সরীসৃপটাকে অনুসরণ করলাম। পোকাটা এবার উড়ে গিয়ে বসেছে দেওয়ালের একপাশে—একেবারে শেষ সীমানায়। এবার টিকটিকিটা বেশ কিছু দূরত্ব বজায় রেখে ওত পাতল। লেজ নাড়ল না। আচম্‌কা ঝাঁপিয়ে পড়ল পোকাটার ওপর - দেওয়ালের শেষ সীমানায়। কিন্তু টাল সামলাতে পারল না। নিচে পড়ে গেল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা ছুটে উপরে উঠলাম। সরীসৃপটা কিছু সময় মরার মতো পড়ে রইল। বোধহয় আচম্বিতে পড়ে যাওয়ার ধাক্কা সামলে নিতে। আমি ভাবলাম ও মারা গেছে।

কিন্তু না, ও মরেনি। নড়ে উঠল, লেজ নাড়ল। তারপর এক ছুটে উঠে গেল দেওয়াল বেয়ে।

আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। এ যেন আমার জয়। এত সময় যেন ঐ কালো বিশ্রী চেহারার সরীসৃপটি নয়, আমিই মুখ থুবড়ে মৃতবৎ পড়ে ছিলাম। ওর ছুটে চলার সঙ্গে আমার বুকের রক্ত নেচে উঠল।

এবার ওকে আর ওত পেতে শিকার ধরার কসরত করতে হল না। সাদা পোকাটাই এদিক ওদিক উড়ে ঠিক ওর মুখের কাছে বসল। এবার সে আর কালক্ষেপ না করে মুহূর্তে ঝাপিয়ে পড়ল এবং নিমেষে মুখের মধ্যে পুরে ফেলল সাদা পোকাটাকে।

আচম্‌কা আমার সারা দেহে বয়ে গেল একটা তীব্র আনন্দের স্রোত। তারই আবেশে চোখ বুজে ফেললাম।

চোখ খুলতেই দেখি সেই সাদা ছোট্ট পোকা—এবার যেন একটা বড় আকারের মানুষ হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। ঠিক সিঁড়ির

উপরে—দোতলার বারান্দায়। মনে তখন প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়না। সারা দেহে তারই আক্ষেপ। পায়ে পায়ে এদিকে এগিয়ে গেলাম। সে আমায় ঠিক যেন টিকটিকি বলে সন্দেহ করল। একটু সরে গিয়ে দূরে দাঁড়াল সে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ওর চোখে-মুখে ভয়ঙ্কর ভীতি ; আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা ও আন্দাজ করেছে বোধহয়। তাই কাঁপছে।

আমি কয়েক পা উপরে উঠতেই ও সরে গেল—একেবারে ঘরের দরজার কাছে। বেরিয়ে যাও—বলে চীৎকার করে উঠল। কিন্তু ওর ধমকানি গ্রাহ্য না করে আমি আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলাম।

ও দরজা বন্ধ করতে গেল তাড়াতাড়ি। আমাকে ঢুকতে না দেবার চেষ্টা। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি। ঠিক টিকটিকি-টার ক্ষিপ্রতায়। লাফ দিয়ে সরে গেল সে। এবার সত্যিই সে ভয় পেয়েছে।

ততক্ষণে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। ও ছুটে দেওয়ালের দিকে গেল। ওকে লক্ষ্য করে আমি এগিয়ে যাই। দেওয়ালের পাশ কেটে, টেবিল ডিঙিয়ে, সোজা ওর দিকে। ও তখন দৌড়াদৌড়ি সুরু করেছে। সারা ঘরময়। আমি ওকে যা বলছি ও তা শুনতে পাচ্ছে না।

এবার ও খাটের কাছে গেল। হাত জোড় করে বিনীত হয়ে কি যেন বলল। দেহে-মনে তখন আমার সেই ক্ষুধার্ত টিকটিকির নেশা। তাই স্পষ্ট কানে এল না ওর কথা। বরং ওর ভয়ার্ত মুখ দেখে আমার কৌতুক বোধ হল।

তোকে খুন করে ফেলব। —খবরদার—। হঠাৎ একটা কাচের বোতল আমার দিকে লক্ষ্য করে উঁচু করল। এবং আমাকে কিছু একটা বলবার অবসর না দিয়েই ছুঁড়ে মারল সেটা। কিন্তু দৈবক্রমে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে দেওয়ালে লেগে চুরমার হয়ে গেল।

এবার সত্যিই ও বিচলিত হয়ে পড়ল। আমাকে আহত

করবার অস্ত্র ব্যর্থ হতেই আত্মরক্ষার উপায় বের করতে ছুটোছুটি আরম্ভ করল—সারা ঘরময়। ওকে আমি বলতে চাইলাম স্থির হয়ে আমার একটা কথা শুনতে। ততক্ষণে টিকটিকির নেশা কেটে গেছে আমার। গীতার কথা মনে পড়েছে। কিন্তু বিনু আমার কোন কথাই গ্রাহ্য করল না। আমি বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। মুহূর্তে বিনু আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আমি টাল সামলাতে না পেরে দেওয়ালের গায়ে আলমারি ওপর প ড় গেলাম। ও আমার বুকের ওপর চেপে বসেছে। ওর ঢস ঢসে মাংসল হাত আমার গলায়; দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। চোখ খুলতে পারছি না। সেই সুযোগে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল আমাব চোয়ালে। মাথা ঘুরে গেল। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। স্পষ্ট বুঝলাম আর সামান্য কয়েকটা মুহূর্ত, তাবপরই দম বন্ধ হয়ে আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী

হঠাৎ সেই টিকটিকিটা যেন আমার চোখে ভেসে উঠল। আমার ওপরে ঠেলে-ওঠা চোখের মণিতে। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস টানতে প্রচণ্ড একটা শক্তি ভিতরে ভিতরে অনুভব করলাম। ও বোধহয় সামান্য ঝুঁকে পড়েছিল। সেই মুহূর্তে, ওর বুকে, ঠিক হৃৎপিণ্ডের ওপর ভয়ঙ্কর বেগে, যতটা শক্তি হাতে আছে, ঘুসি চালালাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘোৎ শব্দ করে ছিটকে পড়ে গেল কয়েক হাত দূরে। খাটের বাজুতে মাথা পড়তেই আর একবার চীৎকার করে উঠল।

কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। কি যেন অকস্মাৎ ঘটে গেল। যার জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম। ওর মাথার পাশ থেকে তখন ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। কয়েকবার দারুণ আক্ষেপে হাত-পা ছুঁড়ল। তারপর ঢলে পড়ে গেল মেঝের ওপর।

আমি তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। রক্তে ঘাড় ভিজে গেছে। সারা শরীরটা কাঁপছে। যেন আর কিছু সময় পরেই আমার চৈতন্য লোপ পাবে। আমি আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালাম।

দরজার কাছে গীতা। আমার রক্তাক্ত শরীর দেখে বিমূঢ়। থম্‌কে দাঁড়িয়ে—দূরে, খাটের কাছে লুটিয়ে পড়ে থাকা বিনুর দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

ও বোধহয় বুঝতে পারল না। বিমূঢ় বিস্ময়ে বিনুর দিকে এগিয়ে গেল। ....দাঁড়াল। বসে পড়ল পাশে। ....গায়ে হাত দিতে সাহস পাচ্ছে না বোধহয়.......। ····ভয়ে নীল হয়ে গেছে। ঝুঁকে পড়ল বিনুর মুখের ওপর। —তারপর দৌড়ে এল আমার কাছে। চোখে-মুখে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক! কোন প্রশ্ন করতে পারছে না। যেন ওর কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে কেউ। আমি বললাম বিনু বোধহয় মারা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠল গীতা। মনে হল তার বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। ভীষণ উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে নিজের গলা চেপে ধরল। তারপর কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে। যেন আমি তার কাছে একটা রাক্ষস। আর একবার গোঙানীর মতো শব্দ করল। এবং লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। হাত পা যেন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসছে। তাছাড়া দাঁড়িয়ে থেকে লাভও নেই কিছু। যার সঙ্গে বোঝাপড়া করব সে হয়তো জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। যে বোঝাপড়া করতে আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এল সে অর্ধ-অচৈতন্য। এ অবস্থায় আমার করণীয় কিছুই থাকতে পারে না।

টলতে টলতে নিচেয় নেমে একটা চলন্ত রিক্‌শায় উঠে গা এলিয়ে দিলাম। আমি তখন ক্রমশঃ অবসন্ন হয়ে যাচ্ছি।

চোখ বুজে আধ-শোওয়া অবস্থায় বাসার ঠিকানা বললাম। রিক্‌শা চলছে।

ঘরে যখন ফিরলাম তখনও আচ্ছন্ন ভাব কাটেনি। চাপ চাপ রক্ত কাঁধে হাতে গলায়। জল তেষ্টা পেয়েছে। রিক্‌শায়ালা ভাড়া নিল। আমায় কিছু জিজ্ঞেস না করলেও কিছু একটা সন্দেহ করল যেন। নিদারুণ ক্লান্তি আর অবসন্নতা আমাকে সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে কিছুই ভাবতে দিচ্ছে না। স্নান করলাম। রক্তের দাগ ওঠাতে সাবান দিতে হল। খিদে বোধ হচ্ছে না। তখনও টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। মেঘ কাটেনি। রাতে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। শিয়রের জানালা খোলা থাকার জন্য বিছানা ভিজে গেছে।

দরজার কাছে একখানা পত্র কুড়িয়ে পেলাম। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের লেখা ; শ্রাদ্ধের জন্য কি কি জিনিস এখনও কিনতে বাকী তারই একটা ফর্দ। সোমাই চিঠিখানা দরজা গলিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে। সোমার কথা মনে পড়তেই সারাদিনের ঘটনাগুলি আমার চোখের সামনে ছায়াছবির মতো ভেসে গেল। কিভাবে কেটে গেল সারাটা দিন। সকালে সোমার আসা, কাজ করা, আমাকে অফিসে পৌঁছে দেওয়া গীতার চিঠি। অফিসের অসমাপ্ত কাজ। গীতার কান্না। আবেগে আত্মসমর্পন। বিনুর ঝাপিয়ে পড়া, পড়ে যাওয়া। আমার ঘুসি, গীতার চীৎকার ও অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। নানা ছবি একসঙ্গে ভেসে উঠে বিহ্বল করে দিল আমাকে।

শোবার আয়োজন করব এমন সময় রসিক এল। —কি ব্যাপার! সোমা রাত অবধি তোমার জন্য অপেক্ষা করে গেল। কাল তোমার বাবার শ্রাদ্ধের দিন। সোমা বলল এখনো নাকি অনেক জিনিস কেনাকাটা হয়নি। —কি ব্যাপার, কোথায় গিয়েছিলে? —রসিক চুরুট ধরিয়ে আরাম করে বসল।

অফিসে ছিলে এত সময় ?

না।

সিনেমায় ?

আমি মাথা নাড়লাম।

তবে ? —রসিক মুখ উঁচু করে তাকাল।

দ্বিধায় পড়লাম। কয়েক মুহূর্ত। তারপর রসিককে আজকের ঘটনাটি বললাম। যথা সম্ভব মনে করে। আস্তে আস্তে।

রসিক বিস্ময়ে স্তব্ধ। হতবুদ্ধির মতো দৃষ্টি। চোখ-মুখ বিবর্ণ। মুখে কথা নেই। চুরুটটা হাতেই পুড়ছে।

কী সর্বনাশ! —কিছু সময় লাগল তার নিজেকে সামলে নিতে। এত বড় ভয়ানক অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা শুনে সে যেন বিমূঢ় হয়ে পড়ল। দ্রুত পায়চারি সুরু করে দিল ঘরের মধ্যে। এক একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে আর অস্ফুট উচ্চারণে—'কী সাংঘাতিক' 'ভয়ঙ্কর' 'সর্বনাশ' এমনি নানান শব্দ নিজেকে ছুড়ে মারছে। এত বড় অস্থিরতা কোনদিনই আমি দেখিনি। বসতে পারছে না কিছুতেই। এক একবার অস্ফুট ধিক্কারে লাঞ্ছিত করছে আমায়। আর বিড় বিড় করে ঈশ্বরকে ডাকছে।

এখুনি তোমার পালিয়ে যাওয়া উচিত—। রসিক আমার মুখোমুখি দাঁড়াল। —পারবে ?

আমি হাঁ-না জবাব না দিয়ে নিস্ক্রিয় হয়ে বসে রইলাম। কারণ পালিয়ে যাবার মতো সচেতন তাগিদ বোধ করছি না। শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হয়ে আসছে। এখন বিছানায় শুয়ে লম্বা একটা ঘুম দেওয়া দরকার। তাছাড়া কোথায় যাব আমি! এই পৃথিবীর নিকট অথবা দূরতম প্রান্তে আমাকে আশ্রয় দেবার মতো নিকটজন কেউ নেই। কোথায় আমি আত্মগোপন করব ? হোটেল ? পান্থশালা ? ধর্মস্থান ? —পথে-প্রান্তরে ? —কিন্তু আজ রাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার মতো শারীরিক কিংবা মানসিক ক্ষমতা অবশিষ্ট নেই।

অস্থির রসিক এক একবার এক একটি জায়গার নাম বলে ; আবার নিজেই নাকচ করে দেয়। এত সময় খুনের সংবাদ পুলিশের কানে গেছে নিশ্চয়ই ! তারপর—

রসিক আমার হাতখানা জাপটে ধরল। যে করেই হোক আগামীকাল পর্যন্ত তোমাকে আত্মগোপন করে থাকতেই হবে। কাল তোমার বাবার শ্রাদ্ধ। কিন্তু -? রসিক কথা বলতে বলতে থেমে গেল কিন্তু কোথায়....! মৃদু উচ্চারিত কথা অসমাপ্ত রইল।

তুমি বসো। বাইরের দরজা আমি তালা বন্ধ করে যাচ্ছি। কোন শব্দ করবে না।

কোথায় চললে ?

বাইরে। রসিক থমকে দাঁড়াল। এ ঘরে নয়। তুমি আমরা ঘরে চলে যাও। এই নাও চাবি। আমি থানায় যাচ্ছি।

তোমার বিছানায় শুতে পারব ?

আমার প্রশ্নে রসিক যেন নির্বাক হয়ে রইল কিছু সময়। চোখ দিয়ে জল পড়ল দু-এক ফোটা। আমার কাছে এসে মুখটা উঁচু করে ধরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল—তোর কপালে বোধহয় আর ঘুম নেই। যা শুয়ে পড়গে।

রসিকের দীর্ঘশ্বাস আর মৃদু উচ্চারিত কথার অর্থ বুঝবার মতো সামর্থ্য আমার তখন নেই। টলতে টলতে রসিকের ঘরে ঢুকে বিছানায় কাত হলাম। দরজায় তালা লাগাল রসিক।

পুলিশ এসে আমার ঘুম ভাঙাল।

তখনো ভালো করে ভোরের আলো ফোটেনি। দরজা খুলে দিলাম। দারোগাবাবু একখানা কাগজ দেখিয়ে বললেন যে, বিনুকে খুন করার অপরাধে আমাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে।

দারোগাবাবুর গলার স্বর অদ্ভুত। যেন একটা ভাঙা ক্যানেস্তারের আওয়াজ। বেল্ট ছিঁড়ে ভুঁড়ি বেরিয়ে আসছে যেন! আমার কাছে জানতে চাইলেন সংবাদ পাঠাবার মতো আমার কেউ আছে কিনা। মাথা নেড়ে জবাব দিলাম যে, নেই। দারোগাবাবু লোক ভালো। হাতকড়া পরাবার আগে চা খেতে অনুমতি দিলেন। আজকের চায়ে একদম চিনি দেয়নি।

আমার ঘর তল্লাশী হল। বিছানাপত্র বাক্সো স্যুটকেশ। এই খুনের সঙ্গে সম্পর্কিত ওদের মনোমতো কিছু পাওয়া গেল না। শুধু সোমার একখানা ফটো আর অনেকদিন আগেকার লেখা দু'খানা চিঠি দারোগাবাবু পকেটে পুরলেন।

আমায় হাতকড়া পরানো হল। ইতিমধ্যে ঘরের আশে-পাশে ছোট খাট ভিড় জমে গেছে। সকলের দৃষ্টি আমার দিকে। ওরা এতদিন আমাকে সকলের ভিড়ে দেখে এসেছে। আজ বিশিষ্ট ভাবে দেখল। ওদের চাপা উত্তেজনা মৃদু প্রশ্নোত্তর সব কিছু আমাকে কেন্দ্র করে। নতুন মূল্যায়ন ঘটছে আমার।

থানায় আসতে সারাটা পথ পুলিশের গাড়িতে ঝিমিয়ে কেটেছে। মাঝে মাঝে একজন সেপাই কাঠের রুল দিয়ে আমাকে খোঁচা মেরেছে। বোধহয় কৌতুকের জন্য। থানায় পৌঁছে আর এক প্রস্থ প্রশ্ন ও জবাব। যিনি প্রশ্ন করছিলেন তার মাথায় তেলতেলে বড় আকারের টাক। কানের দু'পাশে সাদা কালো কয়েক গাছা চুল। কুৎসিত মুখভঙ্গী করে এক একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারছিলেন আর অনেক দিনের ছোপ্ধরা দাঁতগুলো একসঙ্গে দেখা যাচ্ছিল।

অনেক বেলা হয়ে গেলে ওরা আমাকে নিয়ে গেল একটা অপরিসর ঘরে। ঢুকতেই ঝাঁজালো দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল যেন। স্যাঁতসেঁতে ঘর ময়লা ভর্তি। কোণের দিকে দরজার কাছাকাছি অল্প একটু জায়গা শুকনো ও পরিষ্কার। কোণাকুনি মেঝেতে শুয়ে পড়লাম। বড় ঘুম পাচ্ছে তখন আমার।

একটা আরশোলা বার বার গা বেয়ে উঠে বিরক্ত করছে। দু'তিন-বার হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেললাম তবু যেতে চায় না। স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে একটা লবণাক্ত মানুষের গন্ধ তাকে যেন পাগল করে তুলেছে।

. শিকারী বিড়ালের মতো ওত পেতে থাকি। আবার আসতে ধরে ফেললাম। একেবারে হাতের মুঠিতে ধরা পড়ল। এত সময় বার বার আরশোলাটা আমাকে বিরক্ত করছে। একবার ইচ্ছে হল দেওয়ালে থেৎলে মেরে ফেলি। সঙ্গে সঙ্গে হাতখানা দেওয়ালে লাগিয়েই সরিয়ে নিয়ে এলাম। অনুভব করলাম ওর ক্ষুদ্রায়তন দেহে যতটা সামর্থ্য—সেটুকু সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করছে আমার হাতের বাঁধন থেকে মুক্তি পেতে। ঘরের স্বল্পান্ধকারেও ওর কালচে বাদামী দেহের মসৃণতা যেন আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

পারলাম না। বারকয়েক চেষ্টা করেও দেওয়ালে চেপে বিরক্তিকর আরশোলাটাকে থেৎলে দেবার বাসনা দমন করতে হল। আমার কাছে ওটা অত্যন্ত তুচ্ছ ও নগণ্য জীব বলে মনে হল না। বরং ওর সঙ্গে একাত্ম বোধ করলাম।

কখন ওটাকে ছেড়ে দিয়েছি —মনে নেই। কেবল মনে আছে— ছাড়া পেতেই সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে ছুটে পালাল। আমাকে আর বিশ্বাস করতে ও যেন অনিচ্ছুক। বন্ধনমুক্তির দৌড়—কী—বেগবান! আরশোলাটার বেগবান গতিও আমি আন্দাজ করতে অপারগ।

এখন কত বেলা ?

একটা— ? —দু'টো ? —চারটে ? সঠিক বুঝতে পারছি না। ছুটি না হয়ে গেলে এখন পুরোদমে কাজ হচ্ছে। আমার অসমাপ্ত ফাইলগুলো টেবিলে হয়তো পড়ে আছে। খাতার মধ্যে হিসেব মেলানো সেই লাল পেনসিলটাও রয়েছে। কাজে খুশি হয়ে ম্যানেজার ওটা আমায় দিয়েছিলেন। গীতা একদিন গল্প করতে করতে ছুরি দিয়ে ওতে একটা ইংরেজী অক্ষর খোদাই করেছিল।

অক্ষরটা 'বি'। সম্ভবত 'বি' মানে 'বিনু'। পেনসিলটা আমি যত্ন করেই রাখতাম। হারিয়ে না যায়। তবে দারোয়ান লোকটি ভালো। ....আজ কিছু মাল নেপাল যাবার কথা। হয়তো ম্যানেজার এতক্ষণে শূয়োরের মতো ঘোৎ ঘোৎ শব্দ শুরু করে দিয়েছেন। আমার সহকর্মীদের কানে এ-খবরটা এতক্ষণে পৌঁছেছে নিশ্চয়ই। খুনী রবীনকে নিয়ে অল্প সময় পরেই তাদের মুখরোচক গল্প তৈরি করতে দেরী হবে না। ওদের গল্প তৈরির টেক্‌নিক্ সত্যিই তারিফ করার মতো। আমাকে কেন্দ্র করে ওদের তৈরি গল্পগুলো শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম........।

ঘরে নতুন একজন সঙ্গী আসতেই ঘুম ভেঙে গেল।

অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট দেখা না গেলেও ওর বিশাল দেহটা আমার কাছে খুব অস্পষ্ট রইল না। হাঁউ হাঁউ শব্দে কাঁদতে কাঁদতে সে ঘরে ঢুকেছে। তারপর থেকে কেঁদেই চলেছে। একবার উঠে দাঁড়াল। দেওয়ালে মাথা ঠুকল। কপাট ধরে বাইরে তাকিয়ে রইল। তারপর দু'হাতে মাথা চেপে বসে পড়ল মেঝেতে। কাঁদতে কাঁদতে সে বোধহয় একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই মাঝে মাঝে বুকফাটা আর্তনাদে কঁকিয়ে উঠছে "ইয়া আল্লা, ইয়া আল্লা!"

অবাক বিস্ময়ে এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ও আমাকে দেখেও আমার অস্তিত্ব যেন স্বীকার করতে নারাজ। ও যেন এই মহাবিশ্বের সঙ্গীহীন এক নির্বান্ধব যাত্রী। ওকে সহানুভূতি জানাবারও কেউ নেই। তাই ও কেঁদেই চলল। কখনো আস্তে, কখনো জোরে, কখনো মাথা চেপে, কখনো বা বুক চাপড়ে। শুয়ে—বসে—কাত হয়ে। কোন কিছুতেই যেন ও স্বস্তি

পাচ্ছে না। মনে হল কেউ যেন সাঁড়াশী দিয়ে ওর গলা চেপে ধরেছে। মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে; একেবারে শব্দ বের হচ্ছে না। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় গলাটাকে সাঁড়াসী মুক্ত করছে।

পাহারাদার গরাদের বাইরে ঘট্ করে শব্দ তুলে দাঁড়াল।

'মাৎ রোও'—; কান্না লক্ষ্য করে যেন হুকুম দিল সে। হাজত-ঘরের বাইরে অনেকটা দূরে পাহারা দিতে দিতে এর এই ক্লান্তিকর কান্না যেন ওর কাছে অসহ্য বলে মনে হল।

তবু তার কান্না থামে না।

ও যত কাঁদে পাহারাদারের গালাগালিও তত বেড়ে যায়। অশ্রাব্য ভাষায় ওর বাবা মা বংশ-পরম্পরায় জীবিত মৃত সকলেই কেন্দ্র করে পাহারাদারের কুৎসিত শব্দগুলো ব্যবহৃত হতে থাকল। ইচ্ছে হল গরাদ ভেঙে তার মুখখানা দেওয়ালের সঙ্গে চেপে ধরি।

আমি চুপচাপ শুয়ে রইলাম। আমার সঙ্গীর কান্না থেমে গেছে। পাহারাদারের বুটের খট্ খট্ শব্দও আর কানে যাচ্ছে না। এখন আমার চোখের সামনে কেবল একরাশ সর্বগ্রাসী অন্ধকার দৃশ্য-মান। এর কোনও ভাষা নেই। অথচ সমস্ত বিশ্বজগতকে যেন নিদারুণভাবে আলোড়িত করে চলেছে। আমাকে— আমার চৈতন্য— আমার সঙ্গী এই হাজত-ঘর এমন কি এই বিশ্ব-চরাচরকে যেন গ্রাস করে ফেলছে ক্রমশ। আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে কেবল অন্ধকার।

আমি ভয় পেলাম। নিদরুণ ভয়। বুকের মধ্যে যোজনব্যাপী শব্দ তরঙ্গ উঠল। মাথা ঘুরতে থাকল। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। আমি কথা বলতে পারছি না। হাত-পা ওঠাতে পারছি না। কোথায়, কোন্ গভীরে তলিয়ে যাচ্ছি শুধু।

ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠল সমস্ত দৃশ্য। আমার ঘর, অফিস, সোমার মাংসল দেহ, গীতার উন্নত বুক। বাবার ভাবাবেগবর্জিত মুখমণ্ডল, রাঙাপিসীর নিপুণ ভঙ্গীমা, জলে-ডোবা মেয়েটির কান্না, টিকৃটিকিটার ক্ষুধা আর সেই পোকাটার আত্মরক্ষার

প্রাণপণ প্রয়াস। আমার অতীত জীবনের সব চাইতে স্মরণীয় দৃশ্যগুলি একে একে চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু এত সব দৃশ্যের মধ্যে নিজেকে কোথাও খুঁজে পেলাম না।

কান্না পেল আমার। একবার প্রাণভরে আমি কাঁদতে চাই। হঠাৎ মনে হল এতকালের মধ্যে একবারও আমি কাঁদিনি— কাঁদতে পারিনি। অথচ কত মানুষের কান্নাই তো দেখেছি। সোমা, গীতা, সুখুর বৌ, বিয়ে না করতে চাওয়া সেই মেয়েটি, কালো বেশ্যাটা। ভাবাবেগবর্জিত বাবার কান্নাও আমি প্রত্যক্ষ করেছি। বস্তুত আমার জানা পৃথিবীর কেউ বাদ নেই। সকলেই কোন-না কোন সময়ে কেঁদেছে। সকলেরই বুকের ব্যথা-বেদনা কোন-না-কোন কারণে কান্না হয়ে ঝরে পড়েছে। শুধু আমি....। আমি কাঁদিনি।

তবে কি আমি হেসেছি? এতকাল কি হাসির মধ্যেই আমি কাল কাটালাম। জীবনকে কি হাসির মধ্যেই গ্রহণ করেছি।

না। তাও নয়। কান্নার মতো হাসতেও আমি পারিনি কোনদিন। আসলে কান্নার মতো হাসির আশীর্বাদ থেকে আমি বঞ্চিত। হাসি এবং কান্না -জীবনের এই দুই মানবিক ভাবপ্রকাশ থেকে অনেক দূরে আমার অবস্থান।

বহু সময় পরে আস্তে আস্তে আমার চোখের সুমুখ থেকে অন্ধকার সরে গেল। একটা হিমশীতল পরিবেশ থেকে রেহাই পেলাম যেন। উঠে বসলাম আমি। চারিদিক তখন প্রকৃতই নিস্তব্ধ। আমার সঙ্গীও বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। এত সময়ের আচ্ছন্নভাব কাটিয়ে উঠতে পায়চারি সুরু করলাম। হাজত-ঘরের বাইরে তখন ম্লান জ্যোৎস্নায় ধূসর।

থমকে দাঁড়ালাম। মনে হল আমার সঙ্গী জেগে আছে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম; নীচু হয়ে দেখলাম সে উঁচু হয়ে বসে। দু'হাটুর মধ্যে মুখ লুকানো। এক একবার শ্বাস-টানের

মতো দম নিচ্ছে। আর ধনুকের ছিলার মতো বেঁকে যাচ্ছে খানিকটা।

বোধহয় পড়ে যাচ্ছিল। চট করে ধরে ফেললাম। 'এট্টু পানি'—শব্দটা কোন প্রকারে উচ্চারণ করল সে। ' ইয়া আল্লা—" বেশ সবল উচ্চারণে ঈশ্বরের নাম করল একবার।

তাড়াতাড়ি কোণের দিকে রাখা সারাদিনের ময়লা জল মুখের কাছে ধরলাম। ও একচুমুকেই সবটুকু শেষ করল। তারপর দম নিল। ভয়ানক শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। হাত বুলিয়ে দিলাম। বুকে—পিঠে—হাতে। এবার আমার হাত জড়িয়ে ধরল। ছোট্ট শিশু যেমন হারিয়ে যাবার ভয়ে সঙ্গীর হাত চেপে ধরে তেমনি।

গভীর রাত। নিঝুম। হাজত-ঘরে নিজের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও টের পাচ্ছি। চারিদিক ছড়িয়ে পড়েছে একটা উগ্র গন্ধ; নোনা স্বাদু আর কটুর সংমিশ্রণে একাকার। এক একবাব বুকের মধ্যে জ্বলে উঠছে দমকা হাওয়ার সাথে সাথে। বহুকাল ধরে, হাজত-ঘরে যেদিন প্রথম কয়েদীর প্রথম প্রবেশ, এমনি দমকা হাওয়া ঢুকছে। আর ওলটপালট করে দিয়ে যাচ্ছে এখানকার নোনা স্বাদু কটু গন্ধরাশি। আমার মনে হল এর মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে আমার মতো অনেক কয়েদীর গায়ের গন্ধ। যারা এর আগে এখানে হাজত-বাস করে গেছে। তাদের গায়ের উগ্র গন্ধ আর অভিশপ্ত নিশ্বাস-প্রশ্বাস একরাশ ঘন কালো বুক-জ্বালানো ধোঁয়ার মতো জট পাকিয়ে পাকিয়ে সমস্ত হাজত-ঘর ছাড়ানো। তাদের কেউ চোর, কেউ খুনী, কেউ সজ্জন। এ যেন বিচিত্র মানুষের এক মহাতীর্থ।

"বাপজান—" অনেক সময় পরে আমার সঙ্গী কয়েদীর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কানে এল। "বাপজান; তুমি কেন আইছো?—" ঠিক যেন তীর্থযাত্রীর একজন অপরজনকে ঈশ্বরের গুণগান শোনাতে উদগ্রীব।

আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই আচমকা আমার একখানা হাত বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল—“আমি খুনী—।”

খুনীর অনুশোচনাদগ্ধ কান্না, বুকছেড়া কান্না। অন্ধকারের কান্না। এ-কান্না থামে না। থামতেই চায় না। এক একবার বুক চাপড়ায় ; আর আল্লার নাম উচ্চারণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হাজত-ঘরেব নোনা স্বাদ আর কটু গন্ধের নরকে সেই দীর্ঘশ্বাস মিশে যায়।

ওর স্বীকারোক্তি আমার কৌতূহল জন্মাতে পারে না। বিনা প্রশ্নোত্তরে বসে রইলাম। কিন্তু কিছু সময় পরে মনে হল—অন্ধকার হাজত-ঘরের উগ্র গন্ধের মধ্যে অনুশোচনায় দগ্ধ বৃদ্ধের কাছাকাছি বসে আমার স্বাভাবিক বুদ্ধি যেন লোপ পাচ্ছে। মনে হতে লাগল আমার চতুর্দিক জুড়ে প্রেতের দল নৃত্য সুরু করে দিয়েছে। তার মাঝে হাত-পা বাঁধা নিরুপায় একজন দর্শক আমি। এখান থেকে উঠে যাবার কিংবা সরে বসারও যেন উপায় নেই আমার।

তুমি ঘুমাইছো বাপ—নিঃসীম অন্ধকারে খুনীর ক্লান্ত কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হল।

না।

আমার কথাডা শুনবা ? —হাঁউ হাঁউ শব্দে কেঁদে উঠল সে।

সে কাঁদে আর বলে। বলে আর কাঁদে। নিজের জীবনের উত্তাপহীন ইতিবৃত্ত। ছেড়া পাতায় যোগ দিয়ে দিয়ে—সে যা বলল তার ভার অনেক। সংসারে তার একমাত্র ছেলে আর ছেলের বৌ। ছেলে বিয়ে করে পৃথক থাকতে চায়। বাধা দেয় বাপ। ছেলে মানে না। ঘর বাঁধে। বাবা অসহায়। মেনে নিতে বাধ্য। কিন্তু ছেলের নেমকহারামী যেদিন বাপের সম্পত্তি পর্যন্ত পৌঁছাল সেদিন আর সে সইতে পারে না। রুখে দাঁড়ায়। সেয়ানা ছেলের মুখোমুখি বুড়ো বাপ। ছেলের তাগদ বেশী। হেসে উড়িয়ে দেয় ; জোর দেখায় কব্জির ; গায়ের। হিতাহিত জ্ঞান রাখতে পারে

না সে। লাফিয়ে পড়ে কোপ বসিয়ে দেয় ছেলের মাথায়। —শেষ সামর্থ্যের নির্মম প্রকাশ।—ছাওয়াল আমার 'বাপজান রে' বইলা সেই যে ভূমি রইল আর উঠল না—। সঙ্গে সঙ্গে, আমার সঙ্গী এমনভাবে কেঁদে উঠল—মনে হল ওর বুকের জীর্ণ হাড়গুলি বুঝি ভেঙে যাবে।

অনেক রাত এখন। আকাশে তারারা জ্বলছে। এইসব তারায় কোন মানুষ আছে কি? হয়তো আছে। হয়তো এমনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বিকৃত ভঙ্গীমায় কাঁদছে। এমনি খুনের দায়ে হাজত-বাস করছে, কিংবা কিছুই নেই। সব গোলাকার। শূন্য—ফাঁকা। একরাশ ধুলোর সমষ্টি।

গারদ ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। এই মুহূর্তে আমার আর বাইরে যেতে ইচ্ছে নেই। বরং হাজত-ঘরের এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আমার কাছে বেশী কাম্য বেশী লোভনীয়। কেউ নেই—কিচ্ছ্যু নেই। কেউ দেখবে না। কাউকে দেখব না। এমনি গহন অন্ধকারে আত্মগোপন করে থাকব চিরকাল। আর সামনে পড়ে থাকবে প্রশ্নোত্তরহীন একটানা অনুত্তাপ জীবন।

আজই বাবার শ্রাদ্ধের দিন। আর আমি,—বাবার একমাত্র সন্তান—কোথায়?

ব্রাহ্মণকে অবশ্যি টাকাকড়ি দেওয়া আছে। তিনি ইচ্ছে করলে বাকী উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবেন। হয়তো করেছেনও। সোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমার বাকী উপকরণ সংগ্রহ করার কথা ছিল।

বাবার শেষ কাজ কি হয়েছে? পুত্রের অবর্তমানে পিতার তর্পণ? হয়তো হয়নি। শাস্ত্রে এমন বিধি আছে কিনা আমার জানা নেই। বাবা বেঁচে থাকতে কিছুই প্রত্যাশা করেননি আমার কাছে। তাই বোধহয় মৃত্যুর পরেও তর্পণের দায় দায়িত্ব থেকে রেহাই দিলেন আমাকে।

সোমা কি এতক্ষণ আমার বিন্নুকে খুন করার সংবাদ শুনেছে? হয়তো শুনেছে। এত সময় সংবাদটি ছড়িয়ে পড়েছে সারা সহরে। নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছে সোমা। ভয় পেয়ে বাড়ি চলে গেছে; আর বের হয়নি। হয়তো অফিস ম্যানেজার চমকে উঠেছেন পিং পং বলের মতো। বড়বাবুর হাতের নস্যি পড়ে গেছে। সহকর্মীরা হতভম্ব। আমার দ্বারা এমন অসম্ভব ও অস্বাভাবিক কাজ হতে পারে এ তাদের ধারণার বাইরে। রাতারাতি আমি সহরবাসীর অলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়ে পড়েছি।

অথচ প্রকৃতই খুন করা আমার স্বভাব নয়। বিন্নুকে খুন করার ইচ্ছা অথবা প্রস্তুতি কোনটিই আমার ছিল না। ঘটনার মুহূর্ত-পূর্বেও এমন অঘটন আমি কল্পনা করিনি। এমন কি গীতার হয়ে বিন্নুর কাছে কি ধরনের জবাবদিহি চাইব সেটাই আমার কাছে তখন অস্পষ্ট ছিল। ঘটনাটি নিতান্তই আকস্মিক ও পরিকল্পনাহীন। মহাশূন্যে তারা খসার মতো; হঠাৎ—আচম্বিত। ঘটনার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে সত্যি, কিন্তু সে যোগ পূর্ব-পরিকল্পিত অথবা ইচ্ছাকৃত নয়। অথচ দায়িত্বের পুরো ভাগটাই আমার ওপর।

জেল ফটকে ঘণ্টা পড়ল।

রাত চারটে। আমার সঙ্গী চুপচাপ অসাড় অবস্থায় পড়ে আছে। দূরে একজন সিপাই সুর করে মন্ত্রপাঠ করছে। গাঢ় অন্ধকার ফিকে হয়ে এল। এবার আমি মেঝেতে শুয়ে পড়লাম।

পর পর এমনিভাবে কয়েকটা দিন ও রাত কেটে গেল। দিনে ঘুমিয়ে কাটাই; রাতের আঁধারে জেগে থাকি। আমার সেই সঙ্গী দু'দিন এখানে নেই। বোধহয় বিচারের জন্য অন্য কোথাও তাকে নিয়ে গেছে। সে থাকতে তবু যাহোকে কাজ ছিল, হাঁপানি উঠলে

তার বুকে হাত বুলিয়ে দিতাম। এখন বিনা কাজে অতীত রোমন্থন ছাড়া অন্য কোন সম্বল নেই আমার।

মাঝে মাঝে প্রহরীরা ঠাট্টা করে। বিদ্রূপ করে। রসিকতায় মশগুল হয়। ওদের তামাসা দেখে মনে হয় ওদের কাছে আমি যেন চিড়িয়াখানার একটা জীব মাত্র। মানুষ নয়। তাই একদিন একজন সেপাই আমার পিপাসার জল পা দিয়ে ঠেলে দিল। একদিন অন্য একটি সেপাই অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিল আমার বাবার উদ্দেশ্যে। আমি প্রতিবাদ না করে বসে দাঁড়িয়ে বা শুয়ে থাকতাম।

এমনিভাবে দিন আর রাত পার হতে হতে হঠাৎ ওরা একদিন আমাকে হাজির করল কোর্টে।

প্রথমদিনই কোর্টে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। বোধহয় একশ' চোখ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আমার ওপর। তাদের সে চোখের দৃষ্টিতে কি আছে সঠিক বলা দুষ্কর। তবে নিদারুণ এক কৌতূহল যে রয়েছে সেটা স্পষ্ট। সার্কাসের বাঘ দেখার দেখার সময় দর্শকের যেমন দৃষ্টি থাকে, অনেকটা তেমনি।

চেনা মুখ খোঁজ করলাম। কিন্তু পেলাম না। সোমা আসেনি। সে আসবেও না আর। পাইপ মুখে রসিকের চিরপরিচিত মুখখানাও দেখা গেল না। আমি যেন অচেনা সমুদ্রে একরাশ ভয়ঙ্কর ঢেউয়ের মধ্যে হাবু ডুবু খাচ্ছি।

হঠাৎ গীতাকে দেখলাম। সবার পিছনে কোণের দিকে চুপ করে বসে আছে।

আমার মনে একটু সাহস হল। অনেকগুলো অপরিচিত মুখের মধ্যে একটি পরিচিত মুখ। ওর দিকে বার বার তাকালাম। বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে গেছে ওর চেহারায়। উসকো চুল। চোখের

কোণে কালি। রক্তশূন্য মুখমণ্ডল। মনে হল একটা নিদারুণ ঝড় বয়ে গেছে ওর ওপর দিয়ে।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে গীতা সরে গেল। বোধহয় আমার দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করল সে।

একজন উকিল আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভালো করে লক্ষ্য করলেন আমাকে। একজোড়া বড় আর রুক্ষ চোখের সে দৃষ্টি সহ্য করা কঠিন। আমি মুখ সরিয়ে নিলাম।

আপনাকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করব—উকিলবাবুর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বুক কেঁপে উঠল আমার। এমন গম্ভীর কণ্ঠস্বর জীবনে আমি খুব কমই শুনেছি। তীব্র ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভরা চোখে চশমা এঁটে আমার মুখোমুখি হলেন এবার।

আপনার নাম—?

রবীন—।

পুরো নামটি বলুন।

রবীন রায়।

বাবার নাম ?

আস্তে জবাব দিলাম।

তিনি জীবিত ?

না।

কবে মারা গেছেন ?

হিসেব করতে একটু সময় নিয়ে বললাম—কুড়িদিন।

কুড়িদিন ?—ধমকে উঠলেন তিনি। যেন আমি মিথ্যে বলেছি। কিংবা বাবার মৃত্যু কুড়িদিন না হয়ে কম অথবা বেশী হওয়া উচিত ছিল।

ঠিক করে ভেবে জবাব দিন।

উকিল প্রশ্ন করে সোজাসুজি আমার দিকে তাকালেন। পূর্বেকার

স্বীকারোক্তিতে তিনি বোধহয় খুশী নন। এখন কি জবাব দেব? কম অথবা বেশী? কিছু ভেবে ওঠার আগেই আবার ধমক দিলেন তিনি। ভেবে বলুন।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব বেরিয়ে এল—তা বেশ কয়েকদিন হল।

তার মানে আপনার সঠিক মনে নেই? উকীলবাবু উদগ্র আগ্রহে জবাবের প্রত্যাশা করতে থাকলেন।

হ্যাঁ।

আমার জবাবে ওঁর মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হল।—

কবে শ্রাদ্ধ হয়েছে?

জানি না।

সে কি? আপনি ছেলে। অথচ বাবার শ্রাদ্ধ হয়েছে কিনা জানেন না? প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখে-মুখে কৌতুক ও বিস্ময় একসঙ্গে ফুটে উঠল।

হ্যাঁ।

তাহলে তার শ্রাদ্ধাদি কে করবে?

আমি তখন বললাম যে, শ্রাদ্ধের দিন পুলিশ আমার ধরে এনেছে। আমি কিছুই করতে পারিনি।

গীতা দেবীকে আপনি চেনেন?—প্রশ্নের মোড় ঘুরল।

হ্যাঁ।

কতদিন?

চাকরির সময় থেকেই।

কি চোখে তাঁকে দেখতেন আপনি?

উকীলবাবুর এ প্রশ্নের অর্থ বুঝলাম না। জবাব দিতে দেরী হচ্ছে দেখে তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে জানতে চাইলেন যে, গীতার প্রতি আমি কোন আসক্তি বোধ করেছি কিনা?

করেছি। সঙ্গে সঙ্গে হেসে জবাব দিলাম আমি।

উকিলবাবুর খুশীর অন্ত নেই। আমার জবানবন্দীর প্রতি

বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষন করে, জুরীদের উদ্দেশ্যে কথা বলে, মৃদু হেসে ঘুরে দাঁড়ালেন। এবার তাঁকে ঠিক যেন দক্ষ অভিনেতার মতো মনে হল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে পকেটের কলম নিয়ে সুরু করলেন জেরা। একের পর এক। আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা, চাকরির পদমর্যাদা, পৈতৃক সম্পত্তি, পাঠ্যজীবন, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক, বন্ধু-বান্ধব এবং ব্যক্তিগত জীবনধারা। এ-সব প্রশ্নের সঙ্গে খুনের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। তবু অন্তহীন প্রশ্নমালার ঝাকুনিতে তখন আমি প্রায় নাস্তানাবুদ। একটির জবাব দিয়ে মুহূর্তের অবসর মেলে না। পরক্ষণেই আবার একটি প্রশ্ন। তার কোনটি রূঢ়। কোনটি বিনীত। কোনটি সরস কৌতুকে ভরা।

যেন বিচিত্র রসের একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। প্রত্যেকটি সংলাপই সরস অনবদ্য এবং জরুরী। দক্ষ অভিনেতা বিভিন্ন স্বরে আর সুরে সংলাপগুলি আমার দিকে ছুঁড়ে মারছেন। আর আমি বেসামাল হয়ে পড়ছি।

চটপট জবাব দিন। ধমক দিয়ে উঠলেন তিনি। আমি মাথা নীচু করলাম।

বিয়ে করেছেন ?

না।

কেন ?

সে-রাতের ঘটনাটি বললাম।

উকীলবাবুর সে কি উল্লাস। যেন খনির প্রতি স্তরে সোনা আবিষ্কারের উত্তেজনা। তাঁর উল্লাসের সঙ্গে কোর্টে উপস্থিত লোক-লোকজনেরও চোখ-মুখের হাবভাব পালটে যাচ্ছে।

গম্ভীর বিচারকের কলম চলেছে নিঃশব্দে। শুধুমাত্র চাঞ্চল্য নেই তাঁর।

বিনুবাবুর সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয় ?

চট করে সেই ছোট সাদা পোকাটার কথা আমার মনে

পড়ল। টিকটিকিটার হাত থেকে বাঁচবার কি প্রাণান্তকর নিস্ফল প্রয়াস !

ফিক্ করে হেসে ফেলেছিলাম বোধহয়। উকীলবাবুর মুখখানি গম্ভীর হল।

বিনুবাবু যেদিন খুন হয়েছেন, সেদিন আপনি অফিস করেছিলেন ?

না।—ওর চোখের দিকে তাকিয়েই জবাব দিলাম এবার।

কোথায় ছিলেন ?

কোর্টে উপস্থিত লোকজনেরা রুদ্ধশ্বাস। একটি ছুঁচ ফেললেও বোধহয় শোনা যাবে। সকলেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ; সকলেই যেন আমার সামনে দাঁড়ানো উকিলের মতো জবাবের প্রত্যাশায় উদগ্রীব।

আমি গীতাকে দেখবার জন্য একবার উপস্থিত দর্শকের ভিড়ে চোখ বুলালাম। সবার পিছনে গীতা বসে রয়েছে। মাথা নীচু করে। এই অসহ্য উত্তেজনার মধ্যে সেও যেন বিচারকের মতো অচঞ্চল।

ভালো করে ভেবে বলুন—সেদিন কোথায় ছিলেন আপনি ? আর কেন ছিলেন ? উকীলবাবু যেন আমাকে রেহাই দিতে নারাজ।

কি জবাব দেব ? সেদিনকার সেই কাহিনী অনেক বড়। আর অনেকগুলো ঘটনার সঙ্গে জড়ানো। যার একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক আকস্মিক। অহেতুক এই জটিল কাহিনী বলার মতো ধৈর্য বা ইচ্ছা আমার নেই। হয়তো বলতে গেলে একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক রাখতে পারব না। এবং ক্লান্তি আর অবসাদের ভারে ঘুম আসবে।

তাই জবাব না দিয়ে হাই তুলতে থাকলাম।

এবার তাঁকে ভয়ঙ্কর উত্তেজিত মনে হল। ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। কালো গাউন সামলে এক বাণ্ডিল কাগজ হাতে নিয়ে, বার

বার মাননীয় বিচারপতিকে সম্বোধন করে, অনর্গল বক্তৃতা করে চললেন তিনি। কখনো ইংরেজী কখনো বাংলায়। যখন যেটা মুখে আসছে। আঙুল উঠিয়ে আমাকে দেখিয়ে, কোর্টে উপস্থিত লোকজনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে, তাঁর বক্তব্য পেশ করে চললেন। একে একে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকল আমার পারিবারিক ইতিহাস। সামাজিক পরিচিতি। ব্যক্তিগত জীবনের অসংখ্য খুঁটিনাটি ঘটনার ইতিবৃত্ত। যার অনেকগুলোই এখন আমার মনে নেই। আমি একেবারেই ভুলে গেছি। সমস্ত জোড়াতালি দিয়ে যে চরিত্র আমার দাড়াল, সেটা আমি চিনি না। আমার নিজের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বলে মনে হল। আমার চরিত্র বিশ্লেষণ করে তিনি বললেন যে, সহকর্মীণীকে না পেয়ে ব্যর্থ আক্রোশে যে-মানুষ অপর একজনকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে, কয়েকমাসের অন্তঃসত্ত্বা নারীর ওপর হামলা চালায় সেই বর্বর মানুষের আদিম আরণ্যক সমাজেও রেহাই নেই। সভ্য মানুষের সমাজে শাস্তি তাকে পেতেই হবে। এবং সেটা হওয়া উচিত চরমতম শাস্তি। এও বললেন যে, কসাইখানার যে লোকটি পশু জবাই করে, অন্তত দিনের একটি সময়ও সে এমন দায়িত্ব পালন করে, যা মানুষের প্রয়োজন; সমাজের প্রয়োজন আসামীর জীবনে সেই দায়িত্ব-বোধের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। নইলে পিতৃশ্রাদ্ধের দিন, একমাত্র পুত্র অফিস কামাই করে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে এক হতভাগিনী নারীর পিছনে; তারপর ব্যর্থ আক্রোশে নৃশংসভাবে খুন করেছে তার স্বামীকে। আসামী যদি খুন নাও করত তবু পিতৃশ্রাদ্ধের দিন সে যেভাবে সারাটা দিন কাটিয়েছে তার জন্যও সে কঠিন শাস্তি পাবার যোগ্য। মানুষের সমাজে বসবাস করার কোন অধিকার তার নেই।

উকিলবাবুর প্রচণ্ড উত্তেজনা। তাঁর নিপুণ বাচনভঙ্গী, কৌশলী বিশ্লেষণ, তাঁর গম্ভীর স্বরের ওঠা-নামা আমায় বিস্মিত আর মুগ্ধ করল।

আমি স্পষ্ট অনুভব করছি যুক্তির জাল ছড়িয়ে চমৎকার ভঙ্গীমায় আমায় আটকে ফেলা হচ্ছে। এর হাত থেকে আর বোধহয় আমার পরিত্রাণের উপায় নেই। চরিত্রের নির্মম বিশ্লেষণের পর দেখা গেল কিছুই উদ্বৃত্ত নেই আমার। আমার সব ফাঁকা—সব শূন্য। যেন একরাশ বালির সাজানো ঘরে আমি বাস করেছি। জলের ছোঁয়া পেয়ে মুহূর্তে ভূমিস্মাৎ হয়ে গেছে।

কি ফাঁকা আর কি শূন্য জীবন! এমন কিছুই অবশিষ্ট নেই যাকে অবলম্বন করে দাঁড়াব বাঁচব। এতকাল তাহলে এই ফাঁকা আর শূন্য জীবনকে কাঁধে করে ঘুরে বেড়িয়েছি। এক ঘণ্টার বিশ্লেষণেই যার মুখোস খসে পড়ে যায়! কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না!

দুঃখবোধ হল না। ঘৃণাও জাগল না নিজের ওপর। প্রকৃত-পক্ষে বিরাট কি একটা শূন্যতাবোধ আমাকে ক্রমশ তন্দ্রাচ্ছন্ন করে ফেলল।

আবার আমি কয়েদীর গাড়িতে চড়লাম।

আজ আর খিদে নেই। হাজতে পৌঁছেও সেই তন্দ্রার আবেশ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারলাম না। রাতের খাবার এককোণে পড়ে রইল। আমি শুয়ে পড়লাম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে।

তাকিয়ে দেখলাম চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। এমন অন্ধকার আমি এই প্রথম দেখলাম। অস্পষ্ট হিস হিস শব্দ হচ্ছে। মনে হল কে, যেন কাঁদছে?

উঠে বসলাম।

কে কাঁদছে? এমন কান্না কার?

কিছুতেই বুঝতে পারছি না এই গাঢ় অন্ধকারে কে এমন করুণ সুরে কাঁদছে। জীবনে অনেককে কাঁদতে দেখেছি; অনেক

কান্নার সুর আমি শুনেছি। কিন্তু তার কোনটির সঙ্গে এর মিল নেই। এ যেন সমস্ত কান্নার সুর একসঙ্গে মিশে একাকার!

হাতড়ে হাতড়ে পাশের দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেলাম। কান পাতলাম সন্তর্পণে।

এ কি! বাবা কাঁদছেন। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ধক্ করে লাফিয়ে উঠল! সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল কান্না।

আস্তে আস্তে নিজেকে সামলে নিলাম। আমারই ভুল হয়েছে। সামনের দেওয়াল নয়; পিছনের দিক থেকে নারীকণ্ঠের কান্না ভেসে আসছে।

ঠিক যেন সোমা কাঁদছে। ফুলে ফুলে। থেমে থেমে। আমার উপর অভিমান করে একদিন যেমন সে কেঁদেছিল। প্রায় বুকে হেঁটে এগিয়ে গেলাম। অন্ধকারের মধ্যে দেওয়ালে ঘা লাগল মাথায়।

কিন্তু না; এ সোমার কান্না নয়। সোমা কখনো এমন করুণ সুরে কাঁদেনি। এ নিশ্চয় সুখুর বৌ। বুকছেঁড়া মর্মান্তিক চীৎকার করে কান্না। যে-কান্না বে-সুরো, বে-তাল!

লোহার দরজায় দাঁড়িয়ে সে কাঁদছে। প্রায় দৌড়ে দরজায় কাছে এগিয়ে গেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ডান দিককার দেওয়াল ভেদ করে আর্ত চীৎকার উঠল। আমি ডান দিকে ছুটে গেলাম। অবার বাঁ দিকে। পিছন দিকে। সামনে। উপরে। নীচেয়। চারিপাশে। দেওয়ালের বাইরে। আমার বুকের মধ্যে। চারিদিক থেকে বুক ছেঁড়া কান্নার সুর আমাকে ঘিরে যেন নৃত্য সুরু করে দিল।

আমি কাঁপছি। সারা শরীরে যেন হিমপ্রবাহ। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। স্নায়ুগুলো শক্ত মুঠিতে যেন চেপে ধরেছে কেউ। মাথা ঘুরছে। দম আটকে আসছে। কথা বলতে পারছি না। চীৎকার করে বলতে চাইছি—'আমাকে বাঁচাও। কান্নার হাত থেকে

আমাকে তোমরা রক্ষা করো।' কিন্তু শব্দ বের হচ্ছে না কিছুতেই। যেন কেউ সাঁড়াশী দিয়ে আমার গলা চেপে ধরেছে।

ক্রমশ আমার হাত-পা শরীর শিথিল হতে থাকল। শেষ চেতনা-টুকুও অবশিষ্ট রইল না। আমি ঢলে পড়ে গেলাম।

জ্ঞান ফিরল হাসপাতালে।

ডাক্তারের পরীক্ষা হয়ে গেছে কিন্তু ওরা আমাকে কোন প্রশ্ন করল না। ওষুধ দিল। ইনজেকসন করল। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

বোধহয় মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আবার সেই কান্না। এবার একা নয় অনেকে মিলে একসঙ্গে কাঁদছে। সহ্য করতে না পেরে চীৎকার করে উঠলাম—আমাকে বাঁচাও। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এল নার্স। পাশের ঘরের রুগীরা কেউ কেউ জেগে গেছে।

আমি জল খেতে চাইলাম। সে আমাকে জল দিল। ঢক ঢক করে এক চুমুকে শেষ করলাম পুরো পাত্রটা। জল খেয়ে একটু যেন সুস্থ বোধ করলাম আমি। ও আমাকে ওষুধ খাওয়াল, ইনজেকসন দিল। হাত বুলিয়ে দিল বুকে। দারুণ বিক্ষোভের পর আমি তখন অবসাদে আচ্ছন্ন।

এমনি করে ছ'তিনদিন কেটে গেল।

তবু কান্নার হাত থেকে রেহাই নেই। চোখ বুজতে পারি না। ভয় করে; চোখ বুজলেই যেন কান্নার সুর কানে আসে। কখনো কখনো গভীর ক্লান্তিতে তন্দ্রাছন্ন হয়ে পড়ি। পর মুহূর্তেই সেই একই সুরের কান্না ভেসে আসে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে কানে হাত চাপা দিই।

এরপর ওরা আমায় হাসপাতাল থেকে আবার হাজতে নিয়ে এল। ওদের ধারণা আমি সুস্থ হয়ে গেছি। অথচ তখনও আমার শরীর

দুর্বল, বুক কাঁপে। ঘুমাতে পারি না। সেই কান্না ভেসে আসে। তবে এখন যেন অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। এখন হাজতঘরে খোলস-ছাড়া সাপের মতো পড়ে থাকি। অবশ স্নায়ুগুলো আর চঞ্চল হয় না।

আজ আবার আমার একজন সঙ্গী বাড়ল।

লোকটি গায়ের রঙ মিশমিশে কালো। লোমশ দেহ। হাত-পা যেন শালকাঠ। মুখের একপাশে তীক্ষ্ণ কাটা দাগ।

হাজতঘরে ঢুকেই সে শোওয়া-বসার জায়গা ঠিক করে নিল। কোণে পড়ে-থাকা পচা খড় গুছিয়ে বালিস করল। ঠিক করল বিড়ি দেশলাই রাখার জায়গা। মনে হচ্ছে হাজতঘরের সঙ্গে ওর পরিচয় অনেক দিনের। এখানকার প্রত্যেকটি মুহূর্ত ওর জানা।

ও :যেচে আলাপ করল আমার সঙ্গে।

প্রথম সম্বোধনেই দোস্ত। দোস্তকে শুয়ে থাকতে দেখে ঠাট্টা করল যে, হাতে পায়ে বাত হয়েছে কিনা। হলে ও সারিয়ে দেবে। মোক্ষম ওষুধ জানা অছে ওর।

আমি ওর রসিকতার জবাব না দিয়ে একই ভঙ্গীমায় শুয়ে থাকি। ও এগিয়ে এসে আমার গায়ে হ'ত রাখে। আমার ভয় করে। কিন্তু প্রকাশ না করে ওর 'দোস্ত' হয়ে হে হে শব্দে হাসি। আমার নির্বোধোচিত হাসি দেখে ও খুব মজা পায়। আরো বেশী জোরে আমার মাংসহীন পা চেপে দেয়।

কী দিনে কী রাতে ও কখনোই বিচলিত হয় না। এখানকার নোনা স্বাদু আর কটু গন্ধের আমেজে ও যেন সর্বক্ষণ মশগুল হয়ে থাকে। পাহারাদার:দের সঙ্গে এমনভাবে রসিকতা করে যেন ও তাদের অতি পরিচিত জন। আমার নিরুত্তাপে ও মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়। অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করে। দু'একবার কিল ঘুসিও চালায়। প্রতিবাদ

করতে পারি না। বরং শব্দ করে হাসি। যেন এই কিল ঘুসিই আমার প্রার্থিত।

হঠাৎ সেদিন আমার অপরাধের কথা জিজ্ঞেস করে জানতে চাইল যে, কেন আমি হাজত বাস করছি।

জবাবে বিনুর কথা বললাম।

সাবাস! এই তো চাই দোস্ত! সহসা আমার পিঠে সজোরে থাবা মেরে আদর জানিয়ে বলল, মরদের বাচ্চার মতো কাজ করেছিস। চুরি ডাকাতি—দূর্ দূর্। ও সব জেনানাকে লিয়ে।

প্রচণ্ড জোরে হেসে উঠল। ওর হাসিও ভয়ঙ্কর।

আরো দু একটি প্রশ্ন করল। সংক্ষিপ্ত, যতটুকু না দিলে নয় তেমনি জবাব দিলাম। মা বাবা ভাই বোন চাক্‌রি বাক্‌রি নানা প্রশ্নে ও আমাকে বিব্রত করে চলল। জবাব না দিয়ে উপায় নেই। ও অসন্তুষ্ট হলে, মনে হল আমাকে চড় বসিয়ে দেবে। যার ধকল সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

গীতার প্রসঙ্গে আসতেই ও যেন ক্রমশঃ চঞ্চল হয়ে উঠল। মন্তব্যগুলি হয়ে উঠল কুৎসিত আর ঝাঁজালো। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা না থাকলেও কোন্ এক দূর্নীরিক্ষ জীবন অভিজ্ঞতায় মেয়েদের প্রতি অস্বাভাবিক ঘৃণা পোষণ করত সে। তাই গীতাকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি ঘৃণা-সূচক মন্তব্য প্রকাশ করতে করতে এসে পড়ল তার নিজের জীবনে।

অনেক আশা নিয়েই ও বৌ ঘরে এনেছিল। ভালবাসত তাকে নিজের চাইতেও। সাধ্যের অতিরিক্ত যত্ন করত। সোহাগ জানাত। আর তা করতে গিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রমের বোঝা বহন করতে হত তাকে।

কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা করতে পারল না। বৌয়ের দেহ পেলেও মন পেল না। একদিন বৌকে হাতে-নাতে ধরে ফেলল পর-পুরুষের সঙ্গে।

একটি চড়·····। ব্যস। তেমনি প্রচণ্ড জোরে হেসে উঠল সে। শুধু বৌ নয় দোস্ত। সেই শয়তানটাকেও ছাড়িনি। একটা ঘুসি। ব্যস। শেষ হয়ে গেল। তু-তুটো। বুঝলে দোস্ত। জোড়া খুন। কথাটা শেষ করেই আমাকে জড়িয়ে ধরে হা হা শব্দে ও হেসে ওঠে। যেন বিশ্বাসঘাতকতার চরম জবাব দিয়ে মানুষের পরম কর্তব্য পালনের আনন্দ প্রকাশ।

সাধারণত সন্ধ্যার মুখে মুখে খাওয়া শেষ হয়ে যায় আমাদের। প্রায়ই জল-মেশানো খিচুড়ী আর নানা গাছ-গাছড়া মেশানো তরকারী। স্বাদহীন অথচ বিশ্রী তুর্গন্ধ। ও কিন্তু এক চুমুকেই শেষ করে। ক্ষুধার পরিমাণ ওর খুব বেশী। খাবারের প্রতি আমার অরুচি দেখে ও বিস্ময় প্রকাশ করে। কিছু একটা জবাব দিলে হো হো শব্দে হাসে। বলে – সখের কয়েদী।

এখানে মাগ বৌ নেই। ও সব চুলবুলানী চলবে না। খেয়ে নাও দোস্ত।

ওর রসিকতাও অশ্লীল। কিন্তু প্রাণবন্ত। না হেসে পারা যায় না।

অনেক রাত অবধি গল্প চলে। ও বলে, আমি শুনি। লক্ষ্য করেছি ওর গল্পের মধ্যে তুঃখের কথা খুবই কম। ওর জীবনে হয়তো তুঃখ প্রকাশের অবকাশ নেই। নিজের শক্ত সমর্থ চওড়া দেহের মতো মনটাও বোধহয় ওর ভরাট। জোরে কথা বলে। চীৎকার করে হাসে। তুমদাম শব্দ তুলে হাঁটে। সব ব্যাপারেই বে-পরোয়া বে-সরম ভাব। যেন তুড়ি মেরে মেরে জীবনটাকে থোড়াই কেয়ার করে চলেছে। যা আসে আসুক; যা খুসি আসুক। পরোয়া নেই তার।

রাতে ঘুম ভাঙিয়ে হঠাৎ ফিস্ ফিস্ করে বলল, চল পালিয়ে যাই আমরা।

ওর এই অবাস্তব প্রস্তাব আমার কাছে হাস্যকর বলে মনে হল।

এখান থেকে পলাবার মতো কোনও উপায় নেই। তাই আমি সাড়া দিলাম না। তাছাড়া পালাবই বা কেন? পালিয়ে যাবার মতো কোন তাগিদ বোধ করছি না আমি। এই তো বেশ আছি। খাই ঘুমোই শুয়ে থাকি। নির্ভেজাল পরিবেশ। নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। বিন্দুমাত্র দায়-দায়িত্ব নেই আমার। এক্ষেত্রে কেন পালিয়ে গিয়ে ভিন্নতর পরিবেশে পড়ব।

কয়েকবার প্রশ্ন করেও যখন সাড়া পেল না তখন ও চুপ করে গেল। ওর মুখের চেহারা কেমন হল, অন্ধকারের মধ্যে না দেখেও আন্দাজ করতে কষ্ট হল না আমার।

এরপর সারারাত নিঃশব্দে কাটল আমাদের।

সকালে ওকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে। কোন কথা না বললেও ওর চাঞ্চল্য চোখে পড়ল আমার। হাজতঘরের বাঁধন ছেঁড়ার চঞ্চলতা।

দুপুরের দিকে পুলিশ কোথাও নিয়ে গেল ওকে।

রসিক এল। একলা নয়। সঙ্গে সোমা।

সোমাকে প্রথম দৃষ্টিতেই আমি চিনতে পারিনি। তার মাথায় ঘোমটা দেওয়া। কপালের ওপর জ্বল জ্বল করছে সিঁদূরের ফোটা। বধূ হবার স্বাক্ষর।

অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। সোমা মুখ নীচু করল। লজ্জা পেল বোধহয়।

ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞাসা করি কোথায় বিয়ে হয়েছে। কিন্তু চেপে গেলাম ; আমার সাহস হল না।

কেমন আছ ?

রসিকের গলা শুকনো। তার দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিল অন্যদিকে। রসিক বোধহয় কাঁদছে।

কিছুক্ষণ আমরা সকলে চুপচাপ।

রসিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে দেখছে। মাঝখানে লোহার দরজার ব্যবধান। আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। হাতে বুকে মুখে। ওর পুরুষ্ট হাতে কী গভীর মমতা! আমার সামান্য অনুভূতিতেও তা ধরা পড়ল।

চা খাও। কাঁধের ঝোলানো ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে দিল। দূরে দাঁড়ানো একটি পুলিস আপত্তি জানাল সঙ্গে সঙ্গে।

এগিয়ে গেল রসিক। ফিস ফিস করে কথা হল দুজনের। পুলিসটি অন্যদিকে সরে গেল।

আমি চায়ে চুমুক দিলাম। রসিকের চোখে-মুখেও পরম তৃপ্তির ছোঁওয়া। চোখদুটো বোধহয় ভিজে ভিজে।

সোমা একটু দূরে দাঁড়ানো। রসিক লক্ষ্য করল সেটা। পায়ে পায়ে ঘরগুলো দেখার অছিলায় সে দূরে চলে গেল।

এবার সোমা এগিয়ে এল। খুব নম্র পায়ে ।

ঠিক দরজার সঙ্গে প্রায় মিশে দাঁড়াল সোমা। হাত বাড়ালেই স্পর্শ করা যায়। মুখখানা কী ক্লান্ত! কৃশ হয়ে গেছে আগের চাইতে। এত করুণ আর এত বিষণ্ণ মুখ সোমার কোনদিন দেখিনি। মাথায় ঘোমটা নেই। পুরু ঠোঁট জোড়া থর থর করে কাঁপছে। আমার চোখের দিকে পলকহীন তাকিয়ে রইল। সে চোখের ভাষা পড়ার মতো সাধ্য নেই আমার।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সোমা। নির্বাক। অচঞ্চল। মনে হচ্ছে সে যেন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নতুন বোধিতে আত্মমগ্ন। এতকালের শেখা কথা ফুরিয়ে গেছে। এতদিনের জানা ভাষা মনে নেই। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম ওর মধ্যে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য অথবা বিক্ষোভের কোন আভাস নেই। সোমা যেন এখন সব কিছুর ঊর্ধ্বে।

পুলিস এসে সামনে দাঁড়াল।

সোমার ধ্যানভঙ্গ হল যেন। এতসময় পলকহীন চোখে দেখছিল

আমায়। এবার ও সহসা ভেঙে পড়ল। কান্না থামাতে পারছে না। চোখের নদীতে যেন বান ডেকেছে। প্রাণপণ শক্তিতে লোহার দরজা আঁকড়ে ধরেছে সোমা। মুখের মধ্যে পুরে দিয়েছে শাড়ির আঁচল। কপালে আঁকা সিঁদূরের ফোটা লেপটে একাকার।

ওরা চলে গেল।

যাবার আগে রসিক বলে গেল, সে উকীল দিয়েছে আমার কেসে। বলে গেল, ভয় নেই। আমি যেন ভেঙে না পড়ি। অথচ সোমা একটি কথাও বলল না। যেমন নির্বাক এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে চলে গেল। কিন্তু আমি অনুভব করলাম সোমার মনের লক্ষ কোটি কথা এখানে নিরুচ্চার হয়ে ছড়ানো। যা সঞ্চয় করতে পারলে, একটি মহাকাব্য রচনা করা যায়।

অনেক সময় দাঁড়িয়ে রইলাম। জীবন নিয়ে আমার কোন প্রশ্ন নেই। ঘটনা নিয়ে আমার কোন জিজ্ঞাসা নেই। অতীতকে স্মরণ করতে ভাল লাগে না। বর্তমান নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। ভবিষ্যত আমাকে বিড়ম্বিত করে না। সোমা একদিন আমাকে ভালবেসে-ছিল। কিন্তু সে স্মৃতি রোমন্থন করে কি লাভ?

আমার বর্তমান তো অনিবার্য মৃত্যুর মুখোমুখি। তাতেই বা চাঞ্চল্য কোথায়? সোমা আমার কাছে কতটুকু সত্যি? বিনুকে খুন করার মধ্যে কতখানি প্রস্তুতি ছিল আমার মধ্যে? অথচ বিনু সত্যিই খুন হয়েছে; আর সেটা আমার হাতেই।

কিন্তু কই এজন্য তো কোনও অনুশোচনা বোধ করছি না। খুন করা নিয়ে গীতার তৈরী করা কাহিনীও আমাকে ক্ষুব্ধ করছে না। বরং মনে মনে এক ধরনের কৌতুক বোধ করছি। যে কৌতুক বোধি থেকে জাত নয়; নিরুত্তাপ মনের নির্লিপ্ততা থেকে উপজাত। বাবার শ্রাদ্ধ করিনি; একমাত্র পুত্র হয়েও এত বড় নিয়মভঙ্গে আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া কই? কারণ আমি

জানি ঘটনাগুলো যদি বেয়াড়াভাবে আমার সামনে না আসতো তাহলে সবই হত ঠিক এর বিপরীত। যদি মা বেঁচে থাকতেন ; যদি বাবা মারা না যেতেন ; যদি গীতা আর বিনুর মধ্যে কোন বিরোধ না ঘটত ; যদি সোমা আমাকে বিয়ে করত তাহলে ঘটনার বিপরীত স্রোত আমাকে আজকের এই হাজতঘরে মৃত্যুর মুখোমুখি না দাঁড় করিয়ে হয়তো আসন বিছিয়ে দিত অন্যত্র এক নির্বিঘ্ন ও সম্মান-জনক পরিবেশে।

রাত অনেক।

চারদিকে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে শুধু আরশোলা-গুলো উড়ে বেড়াচ্ছে। ক্রমশঃ ধূসর আলো সামনেকার দেওয়াল থেকে মুছে গিয়ে সব অন্ধকারে ঢেকে দিল। সেই সঙ্গে আমার দৃষ্টি।

এমনি অন্ধকারের মধ্যেই কি এতকাল আমি কাটিয়ে এলাম ? এর শেষ কোথায় ?

শেষ কোথায়—এ-প্রশ্ন নিজেকে কোনদিন করিনি। এই প্রথম আমার অর্ধচেতন মনে ধ্বনিত হল। সুরুর ওপর এতকাল আমার কোন হাত ছিল না। শেষ প্রশ্নেও বা থাকবে কেন ?

আগামীকাল আমার ফাঁসি হতে পারে। অথবা এই জেল-হাজত ভূমিকম্পের প্রচণ্ড আলোড়নে ছিট্‌কে যেতে পারে কোথাও ; আমি আকস্মিক বেঁচে যেতে পারি। কিছুই জানি না। আমার ভবিতব্য দুর্নিরীক্ষ ঘটনা-প্রবাহ কোন্ দিকে তাড়িত হবে—জানা নেই। আমার এই উদ্দেশ্যহীন নিঃসঙ্গ জীবনে বাঁচার মাদকতা নেই বলে মৃত্যু-ভয় আমাকে চঞ্চল করতে পারছে না। কারণ এক সর্বগ্রাসী মৃত্যু তো সর্বক্ষণ আমাকে ঘিরে রেখেছে, গ্রাস করছে। যদি আমার এখন ফাঁসি না হয়, যদি আকস্মিক কোন ঘটনা-প্রবাহ আমার মুক্তি ঘটায় তবু কি আমি বাঁচব ?

কপালের শিরাগুলো দপ দপ করছে। যন্ত্রণা। অসহ্য যন্ত্রণা কখনো বুকে, কখনো পিঠে, কখনো বা মাথায়। শুয়ে দেখলাম। পায়চারি করলাম। বসলাম। কাত হলাম। মাথা ঠুকলাম দেওয়ালে ; লোহার দরজায়। দু'হাতে বুক চেপে ধরলাম। তবু সে যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই নেই।

তন্দ্রাছন্ন হয়ে দেখলাম আমি যেন একটা সাদা বেলুনের মধ্যে বসে আছি। হাত পা বাঁধা অবস্থায়। বেলুনটি শূন্যে ঝুলছে। আমি উঠতে চাইছি, কিন্তু আকাশ অনেক উঁচু ; নামতে চাইছি অথচ মাটি নাগালের বাইরে।

কোর্টরুম সেদিন লোকে লোকারণ্য। তিলধারণের স্থান নেই। আমি কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াতেই একটা গঞ্জন উঠল। সতর্ক চাপা উত্তেজিত কথাবার্তা। সকলের দৃষ্টিই আমাকে ঘিরে। অদ্ভুত অচেনা জীব দেখছে যেন।

আমি সেদিনের সেই উকীলবাবুকে বললাম, আমায় চট পট কিছু জিজ্ঞাসা করা হোক। তিনি জানালেন, তাঁর আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

স্বস্তি বোধ করলেও আমার রেহাই মিলল না। একজন নবীন উকিল উঠে দাঁড়ালেন, আমার হয়ে ফরিয়াদী পক্ষকে তিনি কিছু জেরা করতে চান। বুঝলাম যে, এ রসিকেরই কাজ।

ছোট খাটো ধরনের বক্তৃতা দিয়ে গীতাকে জেরা সুরু করলেন তিনি। গীতাকে আজ সুন্দর দেখাচ্ছে। পরণে কালো পাড়ের সাদা শাড়ি। নিরাভরণ; সৌম্যভাব। রুক্ষ চুল পেছন দিকে এলিয়ে দেওয়া। কাঠগড়ায় ঈষৎ ভর দিয়ে আস্তে আস্তে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে গীতা। যেন সব কথাই তার মুখস্ত, চোখের সামনে দৃশ্যমান।

ঘটনার দিন রবীনবাবু অর্থাৎ আসামী কি অফিস কামাই করেছিলেন ?—হঠাৎ নবীন উকিল প্রশ্নের মোড় ঘোরালেন।

হ্যাঁ। জবাব দিতে মুহূর্তকাল দেরী করল না গীতা।

আপনার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল ?

হ্যাঁ।

কোথায় ?

আমার বাসায়।

আপনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন ?

গীতা থেমে গেল মুহূর্তকাল। চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। তারপরেই মাথা উঁচু রেখে স্পষ্ট উচ্চারণে জবাব দিল,— না।

গীতার লেখা সেই চিঠিখানার কথা মনে পড়ল। এখনও আমার ড্রয়ারে রয়েছে।

তখন ক'টা বেজেছিল ?

আন্দাজ বারোটা।

আপনি কি করছিলেন ?

ঘুমাচ্ছিলাম।

অফিস ছিল না ?

ছিল।—গীতা একটু জোরে জবাব দিল।—আমার শরীর খারাপ ছিল সেদিন।

আসামীকে দেখে আপনি কী করলেন ?

আমি ভয় পেয়েছিলাম।—গীতার কণ্ঠস্বরে এখনও যেন তখনকার সেই কল্পিত ভয় রয়ে গেছে। একবার আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন এখনই আবার আমি ওর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।

আসামীর সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয় ? উকিল প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললেন।

দু'বছর।—একটু হিসেব করে জবাব দিল গীতা।

কোন সূত্রে ?

আমরা এক অফিসে কাজ করি।

সহকর্মী হিসাবে আসামী কেমন ছিলেন? নবীন উকীলের উৎসাহ আছে। বাচনভঙ্গীও সুন্দর।

গীতা একমুহূর্তে জবাব দিল যে, সে এর অর্থ বোঝেনি।

উকীল তখন কাঠগড়ায় প্রায় হেলান দিয়ে গীতার কাছে জানতে চাইলেন যে, সহকর্মীর সহযোগিতায় আসামী কোনদিন শৈথিল্য দেখিয়েছে কিনা?

না।

আপনি আসামীর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কিছু জানেন?

জানি না। গীতা ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠছে। জবাব দিতে গিয়ে অস্বাভাবিক জোর দিচ্ছে গলায়।

নবীন উকিল যত তাকে প্রশ্ন করছে ওর কণ্ঠস্বরের উত্তাপও তত বেড়ে যাচ্ছে যেন।

আচ্ছা, আপনি এমন কোন ঘটনা জানেন কি—যাতে আসামী বদমেজাজী বা রুক্ষ স্বভাবের এমন প্রমাণ হয়?

গীতার মুখখানা উদ্বিগ্ন। সৌম্য চেহারায় ফাটল ধরেছে। সহ্যের অতিরিক্ত প্রশ্ন; এ-ভার যেন সে আর বইতে পারছে না। গীতা তখন কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বক্তৃতা সুরু করল। পথের জনতা উত্তেজিত করতে রাজনৈতিক নেতারা যেমন করে থাকেন। সে বলল, পূর্বে কার কি স্বভাব বা চরিত্র ছিল সেকথা জানা তার কথা নয়। সে শুধু জানে, একটু অভিনয়ের ঢঙেই বলল, তার ওপর যে হামলা হয়েছে, যে জঘন্য হত্যাকাণ্ড সে চোখে দেখেছে, সেই কথা।

এর আগে আসামী তার বাসায় কোনদিন গেছে কিনা এ-প্রশ্নে গীতা দ্বিধা আর সংকোচের সঙ্গে জবাব দিল যে, মাঝে মাঝে গেছে। হামেশা নয়।

তাহলে সেদিন তাকে দেখে ভয় পাবার কারণ কি?

ততক্ষণে গীতার মাথা যেন ঈষৎ নীচু হয়ে গেছে। গীতার উকিল বাধা দিতে চেষ্টা করেও পারলেন না। তরুণ উকিল আইনের নজীর দেখিয়ে তাঁকে নিরস্ত করলেন।

আবার গীতাকে সেই একই প্রশ্ন।

অনন্যোপায় গীতা মাথা উঁচু করে বিচারকের দিকে তাকাল। জনতার দিকে। তার উকিলের দিকে। আমি তখন কাঠগড়ার ওপর অন্যমনস্ক হয়ে আঙুল দিয়ে একটি বহু পুরানো গানের তাল দিচ্ছি।

ওকে মাতাল বলে সন্দেহ হয়েছিল। কথাটা শেষ করেই আমার দিকে আঙুল উঁচিয়ে চোখে-মুখে ঘৃণার ভাব ফোটাল গীতা।

মাতাল! শব্দটি উচ্চারণ করেই তরুণ উকিল যেন সোল্লাসে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন। 'মাতাল'! 'মাতাল' শব্দটি হয়ে দাঁড়াল প্রধান আলোচ্য বিষয়। বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, জুরীদের বিবেকের কাছে আবেদন জানিয়ে, বিচিত্র বাক্‌-চাতুর্যে সমস্ত বিচারকক্ষ যেন সম্মোহিত করে দিলেন। তার মধ্যে কত নজীর। কত আইন। কত উদ্ধৃতি। যা আমার কাছে বিরক্তিকর।

আসামী যখন আপনার বাসায় গিয়েছিলেন, তখন বিন্নুবাবু কি করছিলেন?

উকিলের এ-প্রশ্নে জবাব দিতে গীতার সামান্য দেরী হল। ভেবে নিয়ে বলল যে, তখন বিন্নু বাসায় ছিল না। কাজের প্রয়োজনে বাইরে ছিল।

বিন্নুর পৃথক বাসা সম্পর্কে গীতা জানাল যে, তাদের দু'জনের জন্য নতুন বাসা নেওয়া হয়েছিল। এর অন্য কোনও কারণ নেই।

ঐ সময়ে বিন্নুবাবুর সঙ্গে কি আপনার অবনিবনা চলছিল?

না। গীতার কণ্ঠস্বর প্রয়োজনাতিরিক্ত চড়া। উত্তেজিত হয়ে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে উন্মাদের মতো বলল যে, আমি

নাকি ওদের দু'জনকার অবনিবনার কাহিনী রটনা করেছি। সেদিনও ওর সর্বনাশ করতে আমি উদ্যত হয়েছিলাম। বাধা পেয়ে প্রতিশোধের স্পৃহায় বিনুকে গলা টিপে খুন করেছি।

শেষ কথাটা উচ্চারণ করেই একরাশ কান্নায় যেন ভেঙে পড়ল সে। এত বড় মর্মান্তিক দুঃখের ভার বইতে সে অক্ষম।

চমৎকার পরিবেশ। অনেকটা নাটকীয়। গীতা যেন কণ্ঠস্থ নাটক থেকে সংলাপ বলে চলেছে। কোথাও দ্বিধা নেই। জড়তা নেই। স্বরগ্রামের ছন্দ-যতি-মিল প্রশংসনীয়।

গীতা যখন সংলাপ শেষ করল তখন কয়েক মুহূর্ত বিচারকক্ষ যেন সম্মোহিত। পরক্ষণেই গুঞ্জন; ফিস্‌ফিসানি; চাঞ্চল্য। উকিলদের মধ্যে শলা-পরামর্শ; বিচারকের বিচলিত ভাব, গীতার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। সব মিলিয়ে একটি জমাটি নাটকের সার্থক পরিবেশনা। প্রধান ভূমিকা আমার। কিন্তু বক্তব্যহীন। নিষ্ক্রিয় ও নিঃশব্দ দর্শকের মতো।

গীতা বোধহয় ঢলে পড়ে যাচ্ছিল। কে একজন চট করে ধরে ওকে আস্তে আস্তে বাইরে নিয়ে গেল।

এরপর একে একে সাক্ষ্য দিল আরও কয়েকজন। গীতার বাসার ঝি। বিনুর বাসার চাকর। বড়বাবু। ঢ্যাঙা চা-ওয়ালা। অফিসের দারোয়ান এবং আরও কেউ কেউ। আমি সকলকে চিনি না। ওদের বক্তব্য কি ছিল খেয়াল করিনি। হয়তো আদৌ ছিল না। অথবা কিছু ছিল। ওরা আমাকে সমর্থন করল কিংবা করল না সে সম্পর্কে আমি একেবারেই উদাসীন। আমি শুধু এই কথা ভেবে প্রচণ্ড কৌতুক বোধ করছি যে, একজন মৃত লোককে শাস্তি দিতে এদের কী প্রাণান্তকর প্রয়াস।

বাকী সময়টুকু কাঠগড়ায় ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কাটালাম।

আজ কোর্টরুম দুপুর থেকেই নিস্তব্ধ।

উভয়পক্ষের প্রশ্নোত্তর ও সওয়াল শেষ। বিচারক কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী ভাষণে জুরীদের কাছে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। আমার উকিলকে আজ যেন কিছুটা চঞ্চল দেখাচ্ছে।

কিছু সময়ের জন্য স্বাভাবিকভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। কাঠগড়ায় দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে।

কে একজন খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দিল। তখন রায় দিচ্ছেন বিচারক।

মৃত্যুদণ্ড!

মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা জারী হয়ে গেল আমার।

ভিড়ের মধ্যে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল কেউ।

চেয়ে দেখি— দূরে রসিক দাঁড়ানো। সোমা টলে পড়ে যাচ্ছিল। সে দু'হাতে ধরে ফেলল তাকে। আস্তে আস্তে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

কোর্টরুম এখন নিস্তব্ধ। মুহূর্তের মধ্যেই এখানে যেন সব কিছু বোবা হয়ে গেছে। উপস্থিত সকলেই নতমুখ; অনড়। নিঃশ্বাসও পড়ছে না বোধহয়। যে উকিলটি আমার অপরাধ আবিস্কারের জন্য কয়েকদিন জেরা করে কশে আমাকে বিহ্বল আর বিমূঢ় করে দিয়েছেন, এত বড় জয়েও, মনে হল, পুরু কাঁচের চশমার নীচের তাঁর চোখজোড়া ভারী আর ভিজে। হঠাৎ মনে হল এইমাত্র এখান থেকে একটা শব যেন দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বুকখানা হালকা বোধ হচ্ছে আমার। খুব হালকা। বাতাসে ভর করে উড়ে বেড়ানো তুলোর মতো। এতদিন এক গুরুভার প্রশ্ন মাথায় চাপানো ছিল। অনবরতই যাহোক একটা জবাবের প্রয়োজন হত। শত চেষ্টা করেও যে প্রয়োজনের আংশিকও মেটাতে পারিনি। কারণ প্রশ্নের সঙ্গত জবাব পাইনি

কোনদিন। আজ অতি আকস্মিক অতর্কিতে সেই জবাব আমার মৃত্যুদণ্ডের মধ্যে পেয়ে গেছি আমি।

বড় একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। মুক্তির নিঃশ্বাস।

অথচ কিভাবেই না এতকাল আমার জীবন কেটেছে। অসাড় চৈতন্য পঙ্গু বিবেক আর নিস্ক্রিয় ইচ্ছার সমন্বয়ে যে-জীবনটাকে আমার বলে গ্রহণ করেছিলাম, এতকাল তা'র নাগপাশ থেকে মুক্তি পাইনি। অসংখ্য গলি-ঘুঁজির মধ্যে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি শুধু। আমার গতি ছিল, অথচ গন্তব্য ছিল না। যা করেছি—না ভেবেই। যা পেয়েছি—না চেয়েই। ক্লান্তি বোধ করিনি। আবার আনন্দও পাইনি। শুধু একরাশ নিরাসক্তি আমার জীবনটাকে যেন আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে রেখেছিল। তার বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বয়ং-চালিত জীবন গড়ব, এমন সাধ বা সাধ্য কোনটিই ছিল না। না পেরেছি ভালবাসতে। না বুঝেছি ভালবাসার স্বাদ। তাই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভার মুক্তির উল্লাস আমাকে আচ্ছন্ন করল। এমন উল্লাস কি সকলেরই হয়? সকলেই কি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমনি করে বিগত জীবনের শূন্যতার তাৎপর্য অনুভব করে?

বাইরে তখন পড়ন্ত রোদের প্রসন্ন আভা। একটু পরেই দিনের আলো রাতের অন্ধকারে ডুবে যাবে। যে পুলিসের দল আমাকে হাতকড়া লাগিয়ে গাড়িতে ওঠাল তারা চুপচাপ। ওরাও কি মৃত্যুদণ্ডে বেদনার্ত!

আস্তে আস্তে গাড়ি চলছে। আমার মন এখন যেন নেচে চলেছে ঘাসের ফাঁকে-ফাঁকে, পথের ধুলোর বুকে-বুকে। প্রিজনভ্যানের জানালা দিয়ে যে পথটুকু চোখে পড়ে তাতেই। যেন আজ আমি মুক্তির সন্ধানে চলেছি। জীবনের বন্ধন থেকে মৃত্যুর মুক্তি।

ওরা আমাকে এবার এক নতুন জায়গায় নিয়ে এল। একটা ভয়ানক অন্ধকার কারাকক্ষ আমার জন্য নির্বাচিত হয়েছে। ঘরখানা ছোট আর রীতিমতো স্যাঁতস্যেতে। আলো বাতাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন। হাজতঘরে থাকতে তবু বাইরের কিছু চোখে পড়ত। কিন্তু এখানে দৃষ্টি তু'হাত দূরে ধাক্কা খায়।

আজ আর ঘুম আসছে না। ক্ষিদেও নেই। গায়ের জামা খুলে ফেললাম। জল তেষ্টা পেয়েছে। একজন একভাঁড় জল দিয়ে গেল। ঢক ঢক করে এক নিঃশ্বাসে শেষ করলাম। শুতে ইচ্ছে করছে না; পায়চারি করব এমন জায়গাও নেই।

কাল পরশু অথবা তু'দিন কিংবা পাঁচদিন পরে আমার ফাঁসি। এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর পরিণতি!

একবার যদি বাইরে যেতে পারতাম! বাক্সের মধ্যে রসিকের সাদা রঙের পাইপটা রয়েছে। অফিসে ম্যানেজার আমাকে তু'খানা ফাইল দিয়েছিলেন, কয়েক বছরের আমদানি-রপ্তানির হিসেব-নিকেশ। এখন বড়বাবুর ঘাড়ে পড়বে নিশ্চয়ই! বেচারা!

প্রহরীদের ডিউটি বদল হল।

বুক অবধি দাড়ি একজন পুলিস আমার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। আমার দিকে তার করুণ আর স্থির দৃষ্টি। অর্ধোচ্চারিতের মতো আল্লার কাছে প্রার্থনা জানাল। আমি দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। সে কোনও কথা বলল না। হয়তো আমি মৃত্যু-পথযাত্রী বলেই তার এই নীরবতা।

সামান্য তু'একটি কথা বলতে ইচ্ছে হল। আজ রাতে সে কি খেয়েছে! অথবা আজ কোন্ তিথি! কিন্তু ও সরে গেল, কথা বলার সুযোগ মিলল না।

শুয়ে পড়লাম।

একটি নতুন ধরনের আসনের কৌশল শিখিয়ে দিয়ে গেছে

আমার সঙ্গী সেই আগের কয়েদী। দিনে একবার সেই আসন করতে হবে। তাহলে সারাদিন অচৈতন্যের মতো ঘুমিয়ে কাটানো যায়। মৃত্যু-পথযাত্রীর পক্ষে এ এক মহা আসন।

সকাল থেকেই সুরু করতে হবে, মনে মনে কথাটা আওড়ালাম বার কয়েক।

ঘড়ি চলেছে, টিক টিক টিক। সময় চলেছে নিমেষে-নিমেষে পলকে-পলকে। নিরন্তর একটানা যোগক্রিয়া চলছে। একে একে দুই। দুইয়ে দুইয়ে চার। বিরাম নেই। বিরতি নেই একটানা গতি।

আর আমার জীবন-পঞ্জীর সময়ও টুপটাপ ঝরে পড়ছে। প্রতি মুহূর্তের অবিরাম পতনের ফলে বুঝতে পারছি না আর কতটুকু বাকী।

তবু এটুকু অনুভব করছি, বেশী আর বাকী নেই। এখন যে কোনও মুহূর্তে আমার চরম পরিণতি ঘটতে পারে।

কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না যেন। শেষ পরিণতি স্থির জেনেও বিশাল একটানা ঘুম দিতে পারছি কই! জাহাজ ডুবির পর মনুষ্যবর্জিত দ্বীপে আশ্রয় নেওয়া নাবিকের মতো দিশেহারা ভাব। প্রায়ান্ধকার সেল-এর মধ্যে দিনের আলোর প্রবেশাধিকার নেই। তাই আলো-আঁধারের স্পষ্ট পার্থক্য বোঝা এখানে দুঃসাধ্য। তেমনি কঠিন জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান অনুমান করা। জীবন এবং মৃত্যুর এখানে যেন আশ্চর্য এক সন্ধি স্থাপিত হয়েছে। এখানকার অধিবাসীকে তাই জীবনও দাবী করে না। মৃত্যুও দাবীহীন।

কতদিন এখানে বন্দী হয়ে আছি ?

অনেক চেষ্টা করেও হিসেব করতে পারলাম না। এখানকার অখণ্ড অবসর আমার সময় দিন ক্ষণ যেন একাকার করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে রসিক এসেছে। সোমা এসেছে। উকিল এসেছে। ওরা

কি যেন সব বলাবলি করেছে ; তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কিছু কানে গেছে। কিছু যায়নি। কি একটা কাগজে সই করে নিয়ে গেছে ওরা। বিষয়বস্তু মনে নেই।

আমার চেহারার মধ্যে কি অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে ? মোটা হয়ে পড়েছি ? অথবা, যতটা শীর্ণ ছিলাম তার চাইতে বেশী শীর্ণ হয়েছি ? আলোবিহীন গাছের পাতার রঙ বদলায় ; সর্বক্ষণ অন্ধকারে থেকে আমার রঙও কি তেমনি পালটাবে ? যদি পালটায়, তবে সেটা কোন রঙ ? বাইরের, না ভেতরের ? আমার শোবার ঘরখানার অবস্থা এখন কেমন ? তালা ঝুলছে বোধহয় ! রসিকের বৌ কি ফিরেছে ? রাঙাপিসী এখন বড় একলা। বাবার মৃত্যু তাঁকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে। সেই মেয়েটি কি তার প্রার্থিত ঘর পেয়েছে ?

একটা মাছি উড়ে এসে নাকে পড়েছে। তাড়াতে অনেক সময় কেটে গেল। প্রতিদিন সন্ধ্যার দিকে গোটা দুই চামচিকের দৌরাত্মে অস্থির। রাতে সহসা ঘুম আসে না। সেই করুণ কান্না এখনও যেন আমার কানে আসে। কিছু সময়ের জন্য অবশ করে দেয়।

আমার এ অবস্থায় প্রতিটি মানুষই বোধহয় ঈশ্বর-প্রার্থনা করে। ঠিক করলাম, আমিও একদিন প্রার্থনায় বসব। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল সময় নির্বাচনে। কখন বসব ? সন্ধ্যায় ? মাঝরাতে ? ভোরবেলায় ?

একটা মরা আরশোলা দিয়ে সময় নির্বাচনের জন্য লটারী করলাম। ঠিক হল, ভোরবেলায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব।

দু'তিনদিন ঘুম ভাঙেনি। ইদানীং শেষরাতের দিকে বেশ জমাট ঘুম আসে। চেষ্টা করেও ঘুম ভাঙে না। যখন ভাঙে, তখন পেরিয়ে যায় প্রার্থনার সময়।

কয়েকদিন চেষ্টার পর একদিন ঠিক সময়ে ঘুম ভাঙল। কিন্তু প্রার্থনায় বসে বিপদ হল।

ঈশ্বর-প্রার্থনার মন্ত্র জানা নেই আমার।

একজন প্রহরীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম আমি। জবাবে সে এমনভাবে তাকাল, যেন সে পাগল দেখছে। তারপর মুখ ভেংচে উঠল; যেন বাঁদর নাচাচ্ছে।

মিনতি করলাম তাকে। বলে দাও, ঈশ্বর-প্রার্থনায় কোন্ মন্ত্র পাঠ করব আমি!

এবার থমকে দাঁড়াল। গম্ভীর হয়ে কি ভাবল। তারপর বলল 'বল, ফাঁসি।'

দ্রুতপায়ে অন্যদিকে সরে গেল সে।

ফাঁসি! আমার প্রার্থনার মন্ত্র, ফাঁসি!

'ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি!' বারবার উচ্চারণ করলাম—'ফাঁসি ফাঁসি।' আমাদের গাঁয়ের নিতু বৈরাগী যেমন উচ্চারণ করত 'হরি হরি হরি হরি।' বেশ লাগে। বেশ মজা! 'ফাঁসি ফাঁসি'! শব্দটির ধ্বনি আছে। ব্যঞ্জনা আছে। মনে হল, এ সুর-ধ্বনি-ব্যঞ্জনার স্রষ্টা একমাত্র আমিই। স্রষ্টা, লালন-কর্তা মালিক। আর কেউ নয়।

গলা ছেড়ে একবার গান গাইতে ইচ্ছে হল আমার।

সারাটা দিন এই আনন্দে মশগুল। সাধারণত সন্ধ্যাবেলায় রাতের খাবার বলে যা দেয়, তা খাই না। খেতে পারি না, এমন বিস্বাদ। আজ এক চুমুকেই সব শেষ করে ফেললাম। চামচিকে—আরশোলার দৌরাত্মে বিরক্তি বোধ হল না।

অনেক রাতে স্বপ্ন দেখলাম, আমার যেন ফাঁসি হচ্ছে। চারিদিকে লোকজন; গুঞ্জন কলরব উল্লাসধ্বনি। মেয়েরা সাজিয়ে দিল আমায়। ধূপ-ধুনো জ্বলল। শঙ্খ বাজল। মঙ্গলবাণী উচ্চারিত হল; চারদিকে আলোর ফুলঝুরি।

এরই মধ্যে মহাশূন্য থেকে ঈশ্বর নেমে এলেন। তিনি কাঁদছেন। ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কান্নার স্বর ভেসে আসছে। মাটির

লোকজন আনন্দে চাৎকার করছে। ঈশ্বর যত কাঁদছেন, মানুষের উল্লাস তত বাড়ছে।

এ এক অবাক দৃশ্য! ঈশ্বর কাঁদছেন; আর মানুষ উল্লাস প্রকাশ করছে। ঈশ্বরের কান্না ওদের কানে যাচ্ছে না। ওরা আনন্দে নাচছে আর বলছে, ঐ যে দেবতা প্রসন্ন হয়েছেন। আমরা পাপীর যোগ্য শাস্তি দিয়েছি। দেবতার রাজ্য এখন পাপ-মুক্ত। অথচ ঈশ্বর পরম বেদনায় মুহ্যমান। এমন পাপহীন রাজ্য তাঁর কাম্য নয়।

হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙে গেল।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। একজন প্রহরী দরজার কাছে দাঁড়ানো। বড় সাহেবের কাছ থেকে এত্তেলা এসেছে। এখনিই দেখা করতে হবে একবার।

তখনও ঘুমের নেশা কাটেনি। তবু আমার জীবনের শেষলগ্ন যে উপস্থিত, একথাটা আন্দাজ করতে আমার বেগ পেতে হল না। কিন্তু কি আশ্চর্য! এত বড় একটা পরিণতির দিকে আমি চলেছি, ঘুমের নেশায় টলতে টলতে ঠিক নেশাখোরের মতো—অথচ আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গোটা কয়েক সঙ্গীণধারী পুলিস। ওরা সঙ্গে না থাকলেও ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। হয়তো বড় সাহেবের কাছে গিয়ে মৃত্যুদণ্ডের মুহূর্তটি জেনে নিতাম না। তবে পালিয়েও যেতাম না আমি। এখানে ঘাসের ওপর লম্বা একটা ঘুম দিতাম বহু সময় ধরে।

ঘরে ঢুকলাম।

কয়েক মুহূর্ত। বড় সাহেবের দিকে চোখ পড়ল। হাতে একটা কাগজ। আমাকে দেখেই উঠে এলেন কাছে। তারপর কাগজটা বাড়িয়ে দিলেন।

এবং কাগজটা পড়বার আগেই. আবেগে আমার হাত দু'খানা চেপে ধরে বলে উঠলেন, 'ঈশ্বরকে ডাকুন। আপনার ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।' ওঁর চোখজোড়া যেন জলে চিক চিক করে উঠল।

হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম। ওঁর কথার ঠিক অর্থ বুঝতে পারছিলাম না। উনি বুঝলেন। এবার আবেগ সামলে সংযত কণ্ঠে বললেন যে, আমার স্ত্রী সোমা দেবীর আবেদন মঞ্জুর করেছেন সরকার। মৃত্যুর পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আমার শাস্তি।

ভোজবাজি !

ঠিক অনুমান করতে পারছি না যে, কি ঘটে গেল। ফাঁসি—ফাঁসি নাকচ ! যাবজ্জীবন কারাদণ্ড—সোমা আমার স্ত্রী—আবেদন, প্রার্থনা—আবেগে দারোগার হাত জড়িয়ে ধরা—সমস্ত অফিস ঘরের মধ্যে আনন্দ গুঞ্জন—সব মিলে মিশে তালগোল পাকিয়ে যেন একাকার হয়ে গেল।

তাহলে কি আমার মৃত্যু হল না ?

আমি কি বেঁচে গেলাম ?

কয়েক মুহূর্ত....মিনিট····ঘণ্টা... সেকেণ্ড, পরিমাণ মনে নেই।

শ্বাসরোধকারী কয়েক মুহূর্ত।

হঠাৎ চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম, আমি বাঁচব—আমি বাঁচব—আমি এবার বাঁচব। গলা থেকে—বুক থেকে—হৃৎপিণ্ড থেকে—রক্ত থেকে—মজ্জা থেকে অস্পষ্ট একটা স্বর বেরিয়ে এলো। যা আমার নিজেরই অচেনা।

আবার চীৎকার করে উঠলাম—আমি বাঁচব।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেহটা জ্যা-মুক্ত ধনুকের মতো লাফিয়ে উঠল। থর থর করে সারা শরীর কাঁপছে। বুক কাঁপছে।

হৃৎপিণ্ড কাঁপছে। আমার চেতন-অচেতন সমস্ত অনুভূতিই